দন্তীদুর্গ চালুক্যরাজবল্লভকে পরাস্ত করিয়া ঘরহ বিবাদ বশতঃ প্রতিহিংসা স্বরূপ শক্র চালুক্যরাজের 'বল্লভ' উপাধি ধারণ করিলেন। তৎবংশধরেরাও 'বল্লভ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

দন্তীদুর্গের কোন সন্তানাদি ছিল না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় খুল্লতাত প্রঃ কৃষ্ণরাজ সিংহাসন পাইলেন। কৃষ্ণরাজজীর ভ্রাতা ধ্রুবরাজজীর পৌত্র কর্করাজও 'গদীর' অধিকারী ছিলেন।* অতএব কৃষ্ণরাজজী তৎপ্রতি অসদাচরণরূপ দোষ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করতঃ নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

গুজরাটস্থ রাজা কর্করাজের (রাঠোড় শাখা বংশের)

বংশতালিকা।

(প্রথম) গোবিন্দ (তৃতীয় দক্ষিণী রাঠোড় রাজা)
|
কর্করাজ (৪ দক্ষিণী রাঠোড় রাজ)
|
- (দ্বিতীয়) ইন্দ্ররাজ (৫ম দক্ষিণী রাঠোড় রাজা)
- ধ্রুবরাজ
  - গোবিন্দরাজ
    - কর্করাজ গুজরাটেশ্বর (প্রঃ কৃষ্ণরাজ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল)
- প্রথম কৃষ্ণরাজ (৭ম দক্ষিণী রাঠোড় রাজা)

কর্করাজ গুজরাটের রাজা ছিলেন। তৎপরে গুজরাটের স্বতন্ত্রতা বিনষ্ট হয়। ৯৪৫ সম্বতে গুজরাট রাঠোড়দিগের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

কৃষ্ণরাজজী মহা শৈব ছিলেন, সুতরাং তিনি অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইলোরার সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস মন্দিরও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

শৈবদিগের প্রকৃতি প্রায় তমোগুণাত্মক হইয়া থাকে।

---

* গুজরাট রাজ বংশতালিকা দেখ।

"শিবের (দেহেতে) তমোগুণের উদয়।
সেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥"
(ভারতচন্দ্র)

এতৎকারণ বশতঃ কৃষ্ণরাজজী নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চালুক্যদিগের প্রতি মহাদ্বেষ ছিল। তিনি মৃগ শীকারের ন্যায় "বরাহ" শীকার করিতেন। 'বরাহ' অর্থে 'চালুক্যবংশী'। বরাহ চালুক্যদিগের কুলচিহ্ন। চালুক্যদিগের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের রক্ষা হেতু বরাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব 'বরাহ' শব্দ তৎকালে চালুক্যদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত।

কৃষ্ণরাজজীর পাঁচ পুত্র ছিল গোবিন্দরাজ, ধ্রুবরাজ, শুভতুঙ্গ, অকালবর্ষ ও কালেশ্বর।

কৃষ্ণরাজ গতায়ুঃ হইলে পর তৎপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ পিতৃ সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। গোবিন্দরাজজীর অন্য দুই নাম অকালবর্ষ ও বল্লভ।

গোবিন্দরাজ তৎপিতা কৃষ্ণরাজজীর প্রকৃতি কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন নাই। তিনি শ্রমকাতর ও অলস ছিলেন। আলস্য মহাপাপ। আলস্যে পরিণাম ভয়ঙ্কর। কুষ্ঠ রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেমন একে একে খসিয়া পড়ে, অলস ব্যক্তিরও বুদ্ধিবৃত্তি সকল একে একে মরিচা পড়িয়া বিলুপ্ত হয়। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত অলসতার পরিণাম—পরদাসত্ব বা অধঃপতন। ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দরাজও আলস্যরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিলাস ও আলস্য যমক ভাই। যেখানে আলস্য সেখানেই বিলাস। গোবিন্দও অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি কেবল আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেন, রাজ্যের শুভাশুভের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখিতেন না। ইহার কুফল শীঘ্রই ফলিল। তিনি সমস্ত রাজকার্য্যের ভার তদনুজ ধ্রুবরাজের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ধ্রুবরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একেবারে রাজ্যচ্যুত করিলেন। গোবিন্দরাজ মালবা, কাঞ্চী প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের সাহায্যে রাজ্য পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধ্রুবরাজ সকলকে পরাস্ত করিয়া আপনাকে রাজা

ঘোষণা করিলেন। গোবিন্দরাজ ৮৪০ বা ৮৫১ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

৮৪০—৮৫১ সম্বতের মধ্যে ধ্রুবরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ধ্রুবরাজ অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি ভিনমল দেশের রাজা বচ্ছরাজ (বৎসরাজ)কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরপতি, কোশলপতি প্রভৃতি অন্যান্য নরপতির রাজছত্র হরণ (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত) করিয়াছিলেন। তিনি কঞ্জরম দেশের রাজাকে পরাজিত করিয়া তন্নিকট হইতে করস্বরূপ হস্তী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাবংশী নামক পার্শ্ববর্ত্তী অনৈক রাজাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ধ্রুবরাজের রাজ্য রামেশ্বর হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধ্রুবরাজের অনেক সন্তান সন্ততি ছিল।

জীবনাবস্থায় তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ গোবিন্দরাজকে কাঞ্চী দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র রাজ্য গোবিন্দকে দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রজার সুখবর্দ্ধন সকল প্রকার শাসনপ্রণালী বা সকল রাজার উদ্দেশ্য—রাজ্য বা আয়বৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অতএব গোবিন্দরাজ কাঞ্চী লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। অগত্যা ধ্রুবরাজ মধ্যম পুত্রকে লাঠ দেশ (গুজরাট প্রভৃতি) এবং অন্যান্য পুত্রকে অন্যান্য দেশ 'জায়গীর' স্বরূপ প্রদান করিলেন। †

ধ্রুবরাজের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দরাজ পিতৃ সিংহাসন পাইলেন, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের সম্রাট হইলেন। দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ ও তৃতীয় গোবিন্দরাজের মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ। এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র যতদূরে বুঝি দ্বিতীয় গোবিন্দের প্রকৃতি তৃতীয় গোবিন্দের প্রকৃতি হইতে

---

* বরদা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলক হইতে এবং তৃতীয় গোবিন্দরাজের দান পত্র হইতে এই সকল বিষয় জানা গিয়াছে।

† রাধনপুর ও কপরভঞ্জ নামক স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলকে এই সকল লিপিবদ্ধ আছে।

তদধিক দূরে। দ্বিতীয় গোবিন্দ আলস্যপ্রিয় ছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ শ্রম প্রিয় ছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ মহাযোদ্ধা বলিয়া কুমারাবস্থাই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ধ্রুবরাজ অগ্রজকে রাজ্যচ্যুত করিলে পর তদীয় ভ্রাতা পার্শ্বস্থ রাজন্যমণ্ডলীর সহিত আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। কুমার গোবিন্দরাজ অসমসাহসিকতা পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধ্রুবরাজও কুমারাবস্থায়ই তাঁহাকে রাজ্যের কিয়দংশ দিয়া স্বাধীন রাজা করিয়া দিয়াছিলেন।

গোবিন্দরাজের সময় রাঠোড়দিগের রাজ্যের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। শ্রীকৃষ্ণের সময় যাদবগণ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন গোবিন্দেরও রাজত্বকালে রাঠোড়গণও তদনুরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধ্রুবরাজ গঙ্গাবংশী রাজাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। গোবিন্দরাজ তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। গঙ্গাবংশীরাজ কারামুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু অনতিকালপরেই দ্বাদশ রাজন্যমণ্ডলীর সাহায্যে বিদ্রোহীপতাকা উড্ডীন করিলেন। গোবিন্দরাজ এই রাজন্যমণ্ডলীকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিলেন। গঙ্গাবংশীরাজ পুনরায় ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন।

অতঃপর গোবিন্দরাজ গুর্জরেশ্বর (গুজরাটপতি)কে জয় করিয়া মালবাপতিকে আক্রমণ করিলেন। মালবাপতি তাঁহার বশীভূত হইলেন। মালবা হইতে তিনি বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন। বিন্ধ্যাচলের রাজা ধনভেট প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি শীভুবনে (Broach)এ গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি চার মাস পট্টভবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তুঙ্গনদীর অনতিদূরবর্ত্তী পৌল রাজাকে স্ববশে আনিলেন। বেঙ্গী দেশের রাজা বিনা যুদ্ধেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই রাজার নাম বিজয় দত্ত ছিল। ইনি চালুক্যবংশী ছিলেন। ইনি ৮৫১ সম্বৎ হইতে ৮৯৯ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৎপরে গোবিন্দরাজ রামেশ্বরে যুগপৎ বন্যবরাহ শীকার ও তীর্থোদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দরাজের ভ্রাতা গুজরাটপতি ইন্দ্ররাজ স্বীয় সর্দ্দারগণের সহিত তৎবিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলেন। গুজরাটকে

পৃথক্ স্বাধীন রাজত্ব করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ইন্দ্ররাজের কার্য্যের ফল শেষে এই দাঁড়াইল যে তৎপুত্র অপোদ এই সর্দ্দারগণকে দমনে বা স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। ব্যাঘ্র একবার মনুষ্যের রক্তের স্বাদ পাইলে যেমন তদ্ব্যতিত অন্য কিছু চায় না সেইরূপ মনুষ্যও একবার স্বাধীনতারূপ অমৃত পান করিলে, দাসত্ব গরল পান করিতে চায় না। ইন্দ্ররাজ স্বীয় সর্দ্দারগণকে অমৃত পান করিতে দিলেন কিন্তু রাহুর বিষয় ভাবিলেন না। পরিণামে সর্দ্দারগণ রাজাকে মানিল না। তাঁহার রাজ্য ভ্রষ্ট হইল। গোবিন্দরাজের রাজত্বকাল ৮৫১—৮৭১ সম্বৎ।

গোবিন্দরাজের পর তৎপুত্র অমোঘবর্ষ রাজা হইলেন। ইনি ৬৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষ যে কালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অবসরে বেঙ্গী দেশের রাজা বিজয়দত্ত পূর্ব্বাপমান ক্ষালনার্থে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। বিজয়দত্ত রাঠোড়দিগের সহিত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ১০৮ লড়াই করিয়াছিলেন। এবং তৎস্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ১০৮টী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়দত্ত একটী ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। গোবিন্দরাজ তদপেক্ষা বড় রাজা ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও বিজয়দত্ত দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ১০৮ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাঠোড়দিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদ ইহার অন্যতম কারণ।

দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঠোড়রাজাগণও বলপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়া পড়িতে লাগিল। অগত্যা অমোঘবর্ষকে তাঁহার কাকা গুজরাটপতি কর্করাজের সাহায্য লইতে হইল।

গুজরাট রাজবংশ তালিকা।

(প্রথম) গোবিন্দরাজ।

|

কর্করাজ

|

(দ্বিতীয়) ইন্দ্ররাজ | ধ্রুবরাজ, | (প্রথম) কৃষ্ণরাজ

গোবিন্দরাজ

কর্করাজ

অমোঘবর্ষ যৌবনে পদার্পন করিয়াই বিজয়দত্তকৃত অপমান মোচন করিলেন। তিনি চালুক্যবংশ প্রায় ধ্বংশ করিয়া ফেলিলেন। অমোঘবর্ষকে বরাহ অবতারের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। বরাহ অবতার পৃথিবীকে জলকর্দ্দম হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষও হীনতাপঙ্ক হইতে রাঠোড় রাজ্য মুক্ত করিলেন।

গুজরাটপতি কর্করাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ধ্রুবরাজের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য ছিল না। * এই কারণে অমোঘবর্ষ গুজরাট আক্রমণ করিলেন। ধ্রুবরাজ অমোঘবর্ষের সৈন্যকে প্রত্যাখ্যাত করিতে গিয়া অসংখ্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অমোঘবর্ষ ধ্রুবরাজের সিংহাসন তৎপুত্র অকালবর্ষকে প্রদান করিলেন। "মান্যখেত" অমোঘবর্ষের রাজধানী ছিল। তিনি ইহাকে দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরী করিয়াছিলেন। অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত মান্যখেত তৎবংশের রাজধানী ছিল।

অমোঘবর্ষসমগ্র কঙ্কণ দেশ পুলশক্তি নামক স্বীয় জনৈক সর্দ্দারকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অমোঘবর্ষ জৈনধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি জৈনধর্ম্ম-বিষয়ক নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি "পরসোনত্তর মালিকা" (প্রশ্নোত্তর মালিকা) নামক একটী গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটী ৩২ শ্লোকে পূর্ণ। ব্রাহ্মণদিগের ধারণা শুক্রাচার্য্য এই গ্রন্থের কর্ত্তা।

অমোঘবর্ষ ৬২—৬৩ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়রীত্যানুসারে জীবনের শেষাংশ অরণ্যবাসে যাপন করিয়াছিলেন। তদীয় রাজত্বকাল ৯২৩—৯৩৪ সম্বৎ। †

অমোঘবর্ষের পুত্র কৃষ্ণরাজ পিতৃসিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। কৃষ্ণরাজ একটী পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ৯৫০ সম্বৎ তাঁহার রাজত্বের মধ্যাহ্ন

---

* গুজরাটের দ্বিতীয় বংশতালিকা দেখ।

† বরোদা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রফলক, কাবেরী গুহার শিলালিপি এবং মহা পুরাণ, রত্নমল প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে এই সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

কাল। তিনি গুজরাট, ঘোর, অম্বোর, কিলঙ্গ, গঙ্গ, মগধ ও সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশ সমূহ বাহুবলে বশীভূত করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্য মগধ ও উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশ, রাজপুতানা ও গুজরাটের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার অসংখ্য হস্তীবলও ছিল।

বেঙ্গীদেশপতি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিজয় দত্ত কর্ত্তৃক কৃষ্ণরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। বিজয়দত্ত রাঠোড় সর্দ্দার গঙ্গাবংশীকে দমন ও মন্ত্রীরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।' তিনি কৃষ্ণরাজের রাজধানী অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন। বিজয়দত্ত ৯০১ সম্বৎ হইতে ৯৪৫ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিজয়দত্তের মরণান্তর কৃষ্ণরাজ স্বীয় হৃতভূমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎব্যতিরিক্ত তিনি বেঙ্গীদেশও হস্তগত করিয়াছিলেন। পরে বিজয়দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমদত্তের পুত্র যুদ্ধার্জ্জুন কর্ত্তৃক বেঙ্গীদেশ পুনরধিকৃত হয়।

অমোঘবর্ষ লাঠদেশ (গুজরাট) ও ঘোর (রাঠোড় শাখা রাজ্যদ্বয়) স্বরাজ্যভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পৃথীরাজজী চৌহান এই রাজ্যদ্বয় অগ্রেই দখল করিয়া লইয়াছিলেন, তাই অমোঘবর্ষ স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে পারেন নাই।

গুজরাটপতি কর্করাজের পুত্র দ্বিতীয় ধ্রুবরাজ (সম্বৎ ৮২৪) ও তদাত্মীয়বর্গের সহিত অমোঘবর্ষের সৌহৃদ্য ছিল না। ধ্রুবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দন্তীবর্ম্মও তদ্বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তথাপি তিনি সকলকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং স্বরাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যও কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সহচরবর্গের মধ্যেও বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎদ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ধ্রুবরাজ তৎকালিন রাজাদিগের মধ্যে পরাক্রান্ত ও খ্যাতনামা ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের (রাঠোড় রাজ্যের) ও কিয়দংশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাজের সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ধোলপ ছিল। ৯৬৭ সম্বতে গুজরাটরাজ দাক্ষিণাত্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। ধোলপ শত্রুকে নিধন করিলেন এবং কৃষ্ণরাজ তাঁহাকে ও অন্যান্য সর্দ্দারগণকে পারিতোষিক

স্বরূপ গুজরাটরাজ্য প্রদান করিলেন। ৯৬৭ সম্বতে ধোলপের পুত্র পরচাঁদ গুজরাটের রাজা ছিলেন। অতএব ইহা স্থির যে ৯৬৭ সম্বতে গুজরাট দাক্ষিণাত্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ৮১০ সম্বতের পূর্ব্বে রাঠোড়গণ কর্তৃক গুজরাট অধিকারের প্রমাণ নাই।

কৃষ্ণরাজ হৈহয়বংশী চেরী দেশ পতি ককুল কুলচেরীর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কুমারীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান হয়—যুগতুঙ্গ।

যুগতুঙ্গ স্বীয় মাতুল রণবিগ্রহ বা শঙ্করগুণের কন্যা লক্ষ্মীবাইর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।* যুগতুঙ্গ ও লক্ষ্মীবাইয়ের ইন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

যুগতুঙ্গ পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইন্দ্ররাজই 'গদী' আরোহণ করিলেন।

ইন্দ্ররাজ (তৃতীয়) স্বীয় রাজটীকা উপলক্ষে দক্ষিণস্থ কুরুকুণ্ড দেশে † এক মহোৎসবের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি কুরুকুণ্ডসহ ৪০০ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এতৎব্যতিরিক্ত করদ রাজাগণ যে সকল গ্রাম করস্বরূপ তদীয় হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি তাহাও নিষ্কর করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ২০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ("বিক্রম") ও দান করিয়াছিলেন। লাঠদেশস্থ তৈন ও গুম্ম গ্রামদ্বয়ও দান করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত দানে ইহা প্রতীত হইতেছে যে লাঠদেশ ইন্দ্ররাজের পিতা কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের রাজ্য মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্ররাজ পূর্ব্বোক্ত ককুলের পিতামহ অঙ্গদেবের কন্যা বিজয়াম্বা বা অম্বা ‡ দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অম্বা দেবীর গর্ভে ইন্দ্ররাজের দুই পুত্র সন্তান হয়—দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ ও চতুর্থ গোবিন্দরাজ। তদুপলক্ষে তিনি প্রচুর দান করিয়াছিলেন।

---

* হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রথা নূতন নহে। মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করা প্রথা দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধ স্ব স্ব মাতুল কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

† কৃষ্ণা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ।

‡ বিজয়াম্বাও দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়া অম্বা—বিজয়ম্বা—বিজম্বা।

বংশতালিকা (৩)

(দ্বিতীয়) কৃষ্ণরাজ।
- যুগতুঙ্গ (পিতার বর্ত্তমানেই গতায়ুঃ হইয়াছিলেন।)
  - তৃতীয় ইন্দ্ররাজ
    - দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ
    - চতুর্থ গোবিন্দরাজ
  - তৃতীয় অমোঘবর্ষ বা বদ্দীগ
    - তৃতীয় কৃষ্ণরাজ
    - খোট্টীগ

অমোঘবর্ষ তৎপিতা ইন্দ্ররাজের জীবিতাবস্থায়ই কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মতান্তরে তিনি এক বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তদীয় ভ্রাতা গোবিন্দরাজ 'গদী' আরোহণ করিলেন।

চতুর্থ গোবিন্দরাজ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। (চতুর্থ) গোবিন্দরাজ সম্বন্ধে দুইটী বিরোধী আখ্যান আছে। প্রথম আখ্যান মতে তিনি অগ্রজের প্রতি অসদাচরণ করেন নাই। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাপন করিতেন ও স্ত্রীসঙ্গ ঘৃণা করিতেন। এতৎ কারণ বশতঃ তিনি "সৎসঙ্গ" নামে অভিহিত হইতেন। এত বাড়াবাড়ী প্রশংসাতে সহজেই ধারণা হইতে পারে যে তিনি অসৎসঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং তদগ্রজ ইন্দ্ররাজের অকাল মৃত্যুর কারণ ছিলেন।

দ্বিতীয় আখ্যান মতে তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিলেন ও পরে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তৎকারণে তিনি অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি রাজকার্য্যের পক্ষে মৃতকল্প বা অনুপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে চালুক্যরাজ ভীম, কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধিকৃত বেঙ্গীদেশ পুনরায় হস্তগত করিয়া লইলেন। গোবিন্দরাজ চোলবংশীয় রাজা কব বিক ও বুদ্ধ মল্লিকের সহিত একদল সৈন্য দিয়া বেঙ্গীদেশ পুনর্জ্জয় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীম সকলকে পরাস্ত করিয়া ভাগাইয়া দিলেন।

গোবিন্দরাজের পর তদীয় খুল্লতাত তৃতীয় অমোঘবর্ষ (বদ্দীগ) রাজমুকুট ধারণ করিলেন।

আখ্যানান্তরে যুগতুঙ্গের পুত্র বধীগ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দরাজের পর গদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ অমোঘবর্ষ সম্বন্ধেও দুইটী আখ্যান আছে। একটীর মতে সর্দারগণ পতনগামী সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য অমোঘবর্ষকে রাজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টীর মতে যুগতুঙ্গের পুত্র বধীগ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দরাজের পর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বধীগ অমোঘবর্ষের নামান্তর মাত্র। অমোঘবর্ষ ধীরপ্রকৃতি, শুদ্ধচিত্ত এবং সাহসী রাজা ছিলেন। তিনি জয় নামক রাজার কন্যা কন্দক দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্দক দেবীর গর্ভে খোতীগ নামক এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তৎভ্রাতা কৃষ্ণরাজের পর গদী প্রাপ্ত হন।

অমোঘবর্ষের চার পুত্র ছিল—কৃষ্ণরাজ, যুগতুঙ্গ, খোতীগ ও নিরুপম। অমোঘবর্ষ বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন, তাহার কারণ তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের পরেই রাজটীকা প্রাপ্ত হন।

অমোঘবর্ষ ৯৯০ সম্বৎ হইতে ৯৯৭ সম্বৎ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

অমোঘবর্ষের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণরাজজী রাজা হইলেন। কৃষ্ণরাজজীর অন্য তিন নাম ছিল—কনবর (কুমার) দেব, অকালবর্ষ ও বল্লভ। কৃষ্ণরাজজীর দেহ বলবান, রঙ শ্যামবর্ণ এবং বক্ষস্থল প্রশস্ত ছিল। তিনি ধ্রুবপ্রতিজ্ঞ ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অটল মনোবল ও বাহুবলে লঙ্কা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেশের রাজাগণকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ কার্য্যকলাপ শুনিয়া প্রতিদ্বন্দী রাজাগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল। গুজরাটপতি কলীজয় চিতোর আক্রমণ করিতে কল্পনা করিতেছিলেন কিন্তু তৎভয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণরাজের আদেশ বা হুকুমের সামান্য খেলাপ বা ব্যতিক্রম হইলে ভীষণ দণ্ড প্রদত্ত হইত। দন্তীগ ও বপুগ রাজদ্বয় মদনকেতু রাক্ষসের ন্যায় লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। তিনি উভয়ের প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাবংশী রাজা রক্কমলকে নিধন ও তৎরাজ্য ভূতর্যাকে প্রদান

---

* বর্দ্ধা, বেরপত্তন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি অবলম্বন লিখিত।

করিয়াছিলেন। তিনি পল্লোবংশী অন্তীগকে শান্তি প্রদান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাক্ষিণাত্যের রাজা সমূহকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ড্য, শীঙ্গল, চের, চোল ও অন্যান্য দেশপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ৯৯৭ সম্বতে তাঁহার ভ্রাতা যুগতুঙ্গ পরলোক গমন করেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাজা ভৈলের পুত্র রিশুবকে একটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তদীয় জনৈক গঙ্গাবংশীয় সর্দ্দার ভুতীগ (ভুত্য) ও কৈলাশেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের জন্য একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। চোলপতি রাজা [আ]দিত্য কৃষ্ণরাজের অমাত্য গঙ্গাবারি প্রান্ত দেশের রাজা ভুত্যা কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিহত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ তাঁহাকে পাঁচটী পরগণা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়ক্রমকালে কৃষ্ণরাজ কাঞ্চী ও তঞ্জী প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। পল্লোবংশীয়গণ এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি (মাইসরস্থিত) মূলস্থান মন্দিরে একটী অখণ্ড-জ্যোতিঃ প্রদীপ প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ ২৬ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা খোত্তীগ বা নিত্যবর্ষ গদী পাইলেন। নিত্যবর্ষের সময় হইতেই দাক্ষিণাত্যের রাঠোড় রাজ্য নিস্তেজ ও পতনমুখী হইতে লাগিল। তিনি তদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় ভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁহার অদৃষ্ট অত্যন্ত বিগুণ ছিল। সম্বত ১০২৯ অব্দে মালবা দেশের পবর রাজাগণ দাক্ষিণাত্য চড়াই (আক্রমণ) করিয়া তদীয় রাজধানী মান্যক্ষেত্র লুণ্ঠন করিয়াছিল। জৈন পণ্ডিত ধনপালের "লক্ষীনাম মালা" গ্রন্থে মালবাপতি শ্রীহর্ষের ও কর্ণাটপতি হুশাসনের জয় ও খেত্তীগের পরাজয় বর্ণিত আছে। মান্যক্ষেত্র লুট হইলে পর ধনপাল পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় ভগিনী সুন্দরীকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বগর দেশের রাজা ও শ্রীহর্ষের কাকার পুত্র পবরবংশী কঙ্কদেব স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খোত্তীগও যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয়

* জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ ও তাম্রলিপি প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত।

পরবর রাজগণ তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন করিতে সাহসী হইয়াছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং স্বীয় ভ্রাতা নিরুপমের পুত্র কাকারাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

কাকারাজ (কক, ককুল, ধর্কর বা চতুর্থ অমোঘবর্ষ—নামান্তর)

ইনি ১৯ বা শেষ রাজা। কাকারাজা বা চতুর্থ অমোঘবর্ষের সময়ে রাঠৌড়দিগের দাক্ষিণাত্য সম্রাজ্য বিনষ্ট হয়। চালুক্যরাজ তৈলপ রাঠৌড়দিগকে পরাজয় করতঃ তাঁহাদিগের রাজ্য একেবারে ধ্বংশ করিয়াছিলেন। ককুলের গৌরব প্রদীপ তৈলপ-ঝড়ে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ককুলের দুই বলবান পুত্র বা স্বজন যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছিলেন। রাঠোড়দিগের পতনের ইহাই এক কারণ। ২২৫ বৎসর পূর্ব্বে রাঠোররাজ দন্তীবর্ম্ম তৈলপের পিতৃপুরুষদিগের ভূমি বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন। তৈলপ সেই ভূমি পুনরায় হস্তগত বা অধিকার করিয়া লইলেন। বিষ্ণুর বরাহ অবতার যেমন পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তৈলপও তদ্রূপ রাঠৌড়দিগের হস্ত হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিলেন। তিনি রাঠৌড়গণকে নিধন ও পঞ্চালরাজার শিরচ্ছেদন করতঃ ১০৩১ সম্বৎ কাল শ্রীমুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১০৩৮ সম্বতে আষাঢ় মাসে কিঞ্চিৎ ভূদান করিয়াছিলেন। অতএব ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে ১০৩১ সম্বতের শেষভাগে রাঠৌড়রাজ্য ধ্বংশ হইয়াছিল। আরব পরিব্রাজকগণ রাঠৌড়দিগকে "বল্‌হরা" নামে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দন্তীবর্ম্ম কর্ণাটদেশ জয় করিয়া "বল্লভ" পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তদীয় বংশধরেরাও বল্লভ পদবী ব্যবহার করিতেন। দন্তীবর্ম্মের বংশধরেরা আপনাদিগকে "বল্লভ" "শ্রীবল্লভ", "বল্লভ নরেন্দ্র", ও "বল্লভ রাজ" উপাধিমালায় বিভূষিত করিতেন। বল্লভরাজের অপভ্রংশ "বল্‌হরা"। 'বল্লভরাজ'=(চলিত ভাবায়) 'বল্ল-রায়'='বল্লরা' ('রা'='রায়' শব্দের অপভ্রংশ।) অতএব আরবগণ রাঠৌড়দিগকেই লক্ষ্য করিয়া 'বল্লরা' লিখিয়াছেন।

সুলেমান নামক জনৈক আরব পর্যটক ৯০৮ সম্বতে রাঠৌড়দিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "ভারতবাসী ও চীনবাসী

দিগের ধারণা যে পৃথিবীতে চারিটী বই সাম্রাজ্য নাই। যথা (১) বাগদাদের কালিফগণ, (২) চীন দেশের সম্রাট (৩) গ্রীস দেশের অধিপতি এবং (৪) বল্লরা। বল্লরার প্রজাগণের কর্ণ ফোঁড়া বা ছিদ্রযুক্ত। ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আছেন। সকলেই বল্লরার অধীন। বল্লরার দূত অন্যান্য রাজাদিগের সভায় বহু সম্মান প্রাপ্ত হয়। বল্লরার সৈনিকগণ আরবদিগের মত রীতিমত বেতন পায়। তাঁহার অনেক হস্তী ও অশ্ব আছে। অভিষেককালে তিনি যে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা আরবদিগের "দিরম" অপেক্ষা অধিক ভারি। "বল্লরা" কোন রাজার নাম নহে—বংশপদবী। কঙ্কণ দেশ হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত বল্লরার দখল বা আধিপত্য বিস্তৃত আছে। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের সহিত সতত যুদ্ধে রত থাকেন। এই সকল রাজাদিগের মধ্যে গুজরাটপতি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত।"

সম্ভবতঃ স্থলেমান দক্ষিণী রাঠোড়রাজ অমোঘবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন। প্রথমতঃ অমোঘবর্ষ ৮৭২ সম্বৎ হইতে ৯৩২—৩৪ সম্বৎ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনিও 'বল্লভ' পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি রাঠোড়বংশী গুজরাটপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ ৪৮০—৮৫০ সম্বতের মধ্যে তদীয় রাজ্য প্রয়াগ হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। নেপাল রাজবংশাবলীতে লিখিত আছে যে কর্ণাট রাজ্য স্থাপয়িতা দক্ষিণস্থ নান্যদেব নেপাল জয় করিয়াছিলেন ও তৎবংশ ৬ পুরুষ যাবৎ নেপালে রাজত্ব করিয়াছিল। (৮১০—৮৫০ সম্বৎ) পর্য্যন্ত কর্ণাট ভূমিতে রাঠোড়দিগের আধিপত্য ছিল। সম্ভবতঃ ৮৪৬ সম্বতে কর্ণাটস্থ রাঠোড়গণ নেপালদেশ জয় করিয়া থাকিবেক। অথবা ধ্রুবরাজের পর দক্ষিণী রাঠোড়গণ অযোধ্যা হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন ও নেপালদেশের কিয়দংশও দখল করিয়াছিলেন। চীন ও নেপাল দেশ লাগয়া (বা পরস্পর-সীমা-স্পর্শী।) অতএব চীন শব্দে নেপালও বুঝাইতে পারে।

চালুক্য রাজাগণেরও 'বল্লভ' উপাধি ছিল, কিন্তু চালুক্যবংশীয় বল্লভ রাজ্য ৮০৫ সম্বতের পূর্ব্বেই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। চালুক্য বংশী রাজা ÷মঙ্গলী ৬৩৭ সম্বতে নিহত হইয়াছিলেন ও তদীয় রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত

হইয়াছিল। এক অংশ পুলকেশী ও অপরাংশ বিষ্ণুবর্দ্ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্তের বংশধরেরা বেঙ্গী দেশস্থ চালুক্য বা পুরব্ চালুক্য নামে প্রসিদ্ধ। পুলকেশী চালুক্যবংশের মধ্যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পুলকেশীর মৃত্যুর পর কীর্ত্তিবর্ম্ম রাজা হন। ৮০৪—৮১০ সম্বতের মধ্যে দন্তী-দুর্গ বেঙ্গী দেশ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ১০৩০—৩১ সম্বতে তৈলপ ককুলের হস্ত হইতে এই পৈতৃক ভূমি (বেঙ্গী দেশ) ছাড়াইয়া লন। বিশেষতঃ ৮০৪—১০৩০—৩১ সম্বতের মধ্যে পুলকেশী কিংবা বিষ্ণুবর্দ্ধনের বংশধরেরা উল্লেখ যোগ্য রাজা ছিলেন না। অতএব আরবগণ দাক্ষিণাত্যের রাঠৌড় রাজাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াই 'বল্হরা' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। *

বল্লভ বা রাঠৌড় রাজাগণের অঙ্গুরীয় হীরকের উপর নিম্ন লিখিত ভাবের কুল-শ্লোক (Motto) খোদিত থাকিত—'অধ্যবসায় ও অটল প্রতিজ্ঞা সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি প্রদায়ক।'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

তামাক।

মনুষ্যসমাজের উপর তামাক যে কি প্রকার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র প্রায় সকলেই তামাকের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিনই পৃথিবীর সভ্য সুসভ্য সমাজের লোকের জীবনের ইহা একটা অপরিহার্য্য আহার্য্য সামগ্রীর মত হইয়া পড়িতেছে।

---

* খেরপত্তন, ভেরা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি, বীরনারায়ণ, কাঙ্গিড় প্রভৃতি মন্দির মধ্যস্থ শিলালিপি এবং আরব ভ্রমণকারী দিগের লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত।

বড় লোকের বাড়ীতে যাও, দেখিবে বাবুদের বৈঠকখানায় সুবাসিত তামাকের বড় বড় গুড়গুড়ি ও বাঁধান হুঁকা সাজান রহিয়াছে। এবং বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না করিতেই আজ্ঞাবাহক ভৃত্য গুড়গুড়ি কি ভাল বাঁধান হুকাতে তামাক আনিয়া উপস্থিত করিবে। সাহেবী মেজাজী-দের নিকট যাও তামাক সেবনের উপযোগী কত চিত্র বিচিত্র রকমের সরঞ্জাম দেখিতে পাইবে। সিগার, সিগারেট, নস্য ইত্যাদি কত দেশ বিদেশের তামাক, হস্তীদন্ত, রূপা, সোনা, জাপানী বাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ আবরণে আবৃত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণকারীদের রঙ্গক্ষেত্রে শোভিত হইয়া রহিয়াছে। দরিদ্রের কুটীরে যাও আগন্তুককে তাহার সাধ্যমত একটি নারিকেল হুঁকা করিয়া তামাক প্রদানপূর্ব্বক গৃহস্থ তৃপ্তিলাভ করিবে। যাহারা হুকা খায় না তাহাদিগকে চুণ ও শুষ্ক পাতা তামাক মলিয়া খাইতে দিয়া আতিথ্য করিবে। দোক্তা তোজীরা ভাজা দোক্তার দ্বারা গৃহস্বামী কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইবে। তামাক দিন দিনই লোকের অতি প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িতেছে। ইহার কি শুধু বহির্ম্মহলে আদর। অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে যেখানে পাঁচ দশজন মহিলা একখানি মাদুর বা সতরঞ্চির উপরে বসিয়া তাস ক্রীড়া করিতেছেন বা বসিয়া গল্প করিতেছেন সেই মজলিসে মহিলার মণ্ডলীর মধ্যস্থলে একখানি থালা রহিয়াছে, থালার একধারে সাজাপান অন্যধারে একটি খালি পানের উপরে কতকটা ভিজা চুণ, তাহার পাশেই কতকগুলি পানের বোঁটা, ইহার পাশে একটি কৌটাতে করিয়া দোক্তা সাজান রহিয়াছে। যত গল্পও চলিবে সঙ্গে সঙ্গে পান দোক্তা চুণও মুখে উঠিবে। কখন কখন গুখার বড়িও মহিলাদের মুখে প্রবেশ করে। যাঁহারা কড়া দোক্তা ভাল বাসেন অর্থাৎ যাঁহারা অনেক কালের দোক্তা-খোর তাঁহারাই কাঁচা পাতার দোক্তা প্রস্তুত করিয়া খান। আর যাঁহারা নূতন করিয়া দোক্তা খাইতে আরম্ভ করেন তাঁহারাই ভাজিয়া অল্প অল্প করিয়া দোক্তা খাইতে আরম্ভ করেন। এই নূতন শিক্ষানবিশদের অনেক সময় এই নূতন সৎকর্ম্মে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রবীণাদের নিকট কঠোর গালি ও ভৎ'সনা শুনিতে হয়। সেও তাহাদের ভাল তবু লুকাচুরি করিয়া এই অমৃত খাইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতেও ঠিক এইরূপ ভাবেই

তামাকের আদর। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের দৈনন্দিন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কত প্রকার সৌখীন আকারে যে তামাক মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যে জিনিস মনুষ্যের উপরে এতটা প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে তাহার বিষয় একটু বিশেষ ভাল করিয়া জানা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করিতে পারা যায় না।

কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে য়ুরোপবাসী ও আসিয়াবাসীদের নিকট তামাক যে একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা হয়তো অনেকের জানা নাই। এই ভারতে হিন্দু মুসলমানের গৃহে, নিভৃত পল্লীর নৈষ্ঠিক গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে, ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-টোলে, সাধু সন্ন্যাসীর আখড়ায় তামাক এমনি ভাবে প্রবেশ করিয়া নিজের রাজত্ব স্থাপিত করিয়া লইয়াছে, যে তাহারা কখনই মনে করিতে পারে না যে ইহা একটি বিদেশী ম্লেচ্ছোপসেবিত বিজাতীয় জিনিশ। স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া পুরোহিত মহাশয় পূজার্চ্চনাদি ক্রিয়া সমাপন করিবার পূর্ব্বে যখন তামাকের সৌরভে ওষ্ঠদ্বয় বেদমন্ত্রোচ্চারণের উপযোগী করিয়া লন, শিষ্যের কর্ণকুহরে বীজমন্ত্র প্রদান করিবার অনতিপূর্ব্বে যখন তাম্রকূটধূমে স্বীয় জিহ্বা পরিমার্জ্জিত করেন, নামে শ্রীবিষ্ণু বিলাতী কপি, শালগম, গাজরের স্মরণকারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিকের পূর্ব্বে যখন হুঁকা হাতে করেন, তখন কি তাঁহাদের একটিবার স্মৃতিপথে উদয় হয় যে তামাক সনাতন ভারতবর্ষীয় পদার্থ নহে, অসভ্য ম্লেচ্ছের ব্যবহৃত বিদেশীয় জিনিশ?

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস কর্ত্তৃক যখন কিউবাদ্বীপ আবিষ্কৃত হয় তখন তিনি তাঁহার দুইজন নাবিককে সেই দ্বীপটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিতে প্রেরণ করেন। সেই নাবিক দুইজন ফিরিয়া আসিয়া অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীর সহিত ইহাও বলিল যে, দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীগণ এক একটা কাষ্ঠ দণ্ডের মাথায় আগুন লাগাইয়া মুখে করিয়া বেড়ায়, এবং নাক মুখ হইতে ধূম বাহির করিয়া তাহার চারিদিক ধূমাচ্ছিত করিয়া ফেলে। তাহারা গাছের বড় বড় পাতা পাকাইয়া তাহার একধারে আগুন লাগাইয়া দৈত্য দানবের মত ধূমপান করে।

১৪৯৪ খৃঃ অব্দে কলম্বস দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকায় যান, তিনি

আমেরিকাবাসী অসভ্যদিগকে তামাকের গুঁড়া নাকের ভিতরে টানিয়া ভয়ানক রকম হাঁচিতে দেখিয়াছিলেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিয়ার্ডরা যখন পেরেগে আক্রমণ করে, পেরেগেবাসী বর্ব্বরেরা অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাদের হাতের কাছে যে বুদ্ধি আসিল তাহাই করিল। তাহারা দলে দলে একত্র হইয়া ক্রমাগত ঢাক ঢোল বাজাইয়া আক্রমণকারীদের উপরে কাদা পচা জল ছিটাইতে লাগিল। আরো তামাক পাতা চিবাইয়া চিবাইয়া আক্রমণকারী স্প্যানিয়ার্ডদের উপরে পিক ফেলিয়া তাহাদের অন্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানকালে তামাক যত প্রকার বৈচিত্র্য ভাবে সভ্য জগতে বিরাজ করুক না কেন, কিন্তু অসভ্যেরা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে সে সকলের পথপ্রদর্শক। তাহারা পাইপেও ধূমপান করিত। তাহারা চুরোট খাইত, তাহারা নস্য লইত তাহারা দোক্তা রূপেও চিবাইত। তবে বর্ত্তমান সুসভ্য ব্যক্তিদের আর বাহাদুরী করিবার রহিল কি? বাহাদুরীর এই যে বাণিজ্য সূত্র হইতে মধ্যে ইহা অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা বাহির হইয়া সর্ব্বত্র এই অনিষ্টকারী তামাক সম্প্রসারিত হইতেছে মাত্র।

বর্ত্তমানকালে সভ্য সমাজে প্রচলিত তামাকের পাইপ, চুরোট, নস্য, দোক্তা যে কিছু সৌখীন সামগ্রী আছে সমস্তই একরূপ বলিতে গেলে অসভ্য আমেরিকাবাসী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। এই তো তামাকের ইতিহাস।

ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলেজাবেথের রাজত্বকালে স্যর ওয়াল্টার রেলে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিলাতে প্রথম তামাকের ধূমপান প্রচলন করেন। গর্ব্বিত সুসভ্য জগতেরও সুসভ্য লোকের ঘৃণিত অসভ্যদিগেরই আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত বর্ত্তমানকালের বহুমূল্য সামগ্রী যে তামাক তাহা পৃথিবীর প্রায় রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলেরই নিকট আদৃত।

ডাক্তার, রসায়নবিদ প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে প্রসিক এসিডের পর এই তামাকের মত উগ্র বিষ পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রায় অর্দ্ধসের তামাকে যতটা বিষাক্ত পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা তিন শত লোকের প্রাণ সংহার করা যায়। আজকাল লোকে যে চুরোটের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন



কলম্বস্।



স্যার ওয়াল্টার রেলে।

তাহার বিষয় একবারও ভাবেন না যে ইহা কি প্রকার বিষাক্ত পদার্থ। একটা চুরোটের মধ্যে এতটা বিষ আছে যে ইহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দুইজন লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারা যায়। কিন্তু এখনি ইহা হইতে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'হ্যাঁ এত লোকে এত চুরোট খাইতেছে তাহাদের মৃত্যুও দূরে থাক কোন অসুখই করে না; বরং অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আসিলে তারপরে একটা চুরোট ফুঁকিলে কি এক কলিকা তামাক খাইলে ক্লান্তি ভাব একেবারে চলিয়া যায়। মনুষ্য নিজ মনের অধীন। মন যে পথে লইয়া যাইবে মনুষ্যও সেই পথে যাইবে। যে চুরোট খায় সে চুরোটের ধূমপান করিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে আঃ এতক্ষণে আমার সমুদয় শ্রান্তিভাব চলিয়া গেল আমি আবার দ্বিগুণ তেজে কাজ করিতে পারিব। যাহারা তামাক প্রভৃতি নেশাকর দ্রব্যের বশবর্ত্তী তাহার মনের শাসনকর্ত্তা নহে, কিন্তু মন তাহাদের শাসনকর্ত্তা।

তামাকে তৈলের মত এক প্রকার পদার্থ আছে তাহাকে নিকোটিন বলে। এই নিকোটিনই প্রধান বিষ। যাঁহারা পাইপ খাইয়া থাকেন ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে পুরাতন পাইপের নলের ভিতরে এক রকম তৈলাক্ত পদার্থ জমে—উহাই নিকোটিন বিষ। ধূমপান করিতে করিতে এই নিকোটিন বিষ ক্রমে শরীরের ভিতরে অল্প অল্প করিয়া প্রবেশ করে। এই নিকোটিন বিষের দ্বারা মনুষ্য ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। হুকায় কিন্তু একটা ভাল। নিম্নে জল থাকাতে তামাকের কড়া বিষাক্ত ভাব অনেকটা চলিয়া যায়। সুসভ্য আমেরিকাবাসীরা আজকাল পাইপ ইত্যাদি অপেক্ষা হুকা শতগুণে ভাল বুঝিতে পারিয়াই হুকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পল্লীগ্রামবাসীরা অনেক সময় তামাকের পাতার রস দিয়া জোঁক, সর্প প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু মারিয়া থাকে। তামাকের যদি কিছু গুণ থাকে তো এই যে ইহা কীটাদিনাশক বটে। গলিত পচা দ্রব্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করিবার কালে ইহার ধোঁয়ার বিশেষ উপকার দেখে। তামাকের পাতা উদরের উপরে রাখিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক বমন আরম্ভ হইবে। অনেকে বগলে তামাকের পাতা লুকাইয়া রাখিয়া জ্বর করিয়া থাকে। মনুষ্য শরীরের

উপরিভাগ অপেক্ষা অভ্যন্তর ভাগ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদ্বারা কোমল করিয়া গঠিত। যে জিনিস শরীরের বাহিরের চর্ম্মের উপরে প্রয়োগ করিলে শরীর বিষাক্ত হইয়া যায়, সেই পদার্থ আহার করিলে পর শরীরাভ্যন্তরের ফুসফুস্ উদর প্রভৃতির সূক্ষ্ম কোমল শিরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে উৎসন্ন করিয়া দেয় না কি ?

অবশ্য যাঁহারা তামাক ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা বলিবেন যে তামাকের বিষাক্ত গুণ দ্বারা আমাদের দেহের যে কোন অনিষ্ট হইতেছে, তাহা আমরা চক্ষেও দেখিতে পাইতেছি না বা স্পর্শেও অনুভব করিতে পারিতেছি না। তবে এত কথা শুনাইবার আবশ্যক কি ? ইহার উত্তরে এই বলা যায় পরমেশ্বর মনুষ্যের শরীর এমন প্রণালীতে গঠিত করিয়াছেন যে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া ভাল মন্দ যে কোন জিনিস সহ্য করাইলে শরীর ক্রমে সকলি সহ্য করিতে পারে। এমন কি বিষাক্ত পদার্থও এই নিয়মে শরীর অনায়াসে ধারণ করিতে পারে। বেলেডোনা কেউটে সাপের বিষ প্রভৃতি অনেক লোকে অল্প অল্প মাত্রায় খাইতে আরম্ভ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যায়। আফিংখোরের শরীরকে এই প্রকারেই আফিংএর বশীভূত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই অভ্যস্ত হউক না কেন তামাকের বিষ ক্রমাগত শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে, নানা রোগ উৎপন্ন করে। আজ যে বিষ তুমি পান করিয়াছ, অভ্যাস বশতঃ তুমি তাহার কুফল আজই বুঝিতে না পার; কিন্তু সেই বিষ অল্পে অল্পে তোমার শরীরকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবেই।

অনেক সময় আমরা ভাবিয়া আকুল হই যে সুস্থ পিতামাতার কোলে দুর্ব্বল চিররুগ্ন সন্তান জন্মিল কেন ? তবু অনুসন্ধান করিয়া কখনো তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করি না। যদি বা কেহ অঙ্গুলি দিয়া কারণ নির্দ্দেশ করাইয়া দেয় আমরা হয় তো বিশ্বাস যোগ্য নয় ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিই। আমরা আমাদের সৌখীন বিলাসের প্রশস্ততার জন্য যতই বিশ্বাস করি আর না করি তামাক যে উগ্র বিষ এবং ইহা শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মহোপকারী পদার্থ তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি এখনও বলিতেছি।

ধূমপায়ীকে অথবা তাহার বংশধরদের প্রায়ই এই সকল রোগগ্রস্ত হইতে হয় ;—কণ্ঠনালীর ঘা (sore throat), হাঁপানি, ক্ষয়কাশ, হৃদরোগ, মস্তক-ঘূর্ণী, অজীর্ণ, ক্যান্সার, পক্ষাঘাত। এই ধূমপান করিয়া অথবা নস্য প্রভৃতি লইয়া শরীরের রক্ত পাতলা হইয়া যায় এবং শিরাদি ঝলসাইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীঃ—

নব হিতোপদেশ।

বখরা।

হোরে মোরে দুটি চাঁদ ব'সে আছে ঘাসে
বৈশাখের ফুরফুরে মধুর বাতাসে ;
ক্ষুধায় গড়ায় প'ড়ে মোরেটা আতুর
এদিকে ক্লার মারে হোরেটা ছাতুর
মোরেটার মোটা বুদ্ধি হোরেটা চতুর
পদে পদে বুদ্ধি দোষে মোরেটা ফতুর ;
একদিন দুজনায় হাটে গেল মেতে
কিনিল ছাগল এক মহা হরষেতে ;
কেনা হ'লে মোরে ভাবে আর দেরি নয়,
শেষে এই ছাগ ল'য়ে কি জানি কি হয়,
এই বেলা দুজনায় ফেলি বখ্‌রা ক'রে
শেষে যদি এই ল'য়ে গোল করে হোরে,
ভাবিয়া বলিল মোরে, "ভাগ করি আয়
গণ্ডগোল সম্ভাবনা নাহি আর তায় ;"
রাজি হ'ল হোরে তায় অম্লান বদনে,—
নেড়ে ভোলা মোরেটার ভারি খুসি মনে,

হোরে তৎপর সেই, বলে নিয়ে চলি,
কসাই খানায় গিয়ে দিয়ে আসি বলি,
এই ব'লে নিয়ে যায় কসায়ের গলি ;—
মোরে ব্যস্ত হ'য়ে বলে "শোন্ শোন্ বলি
হোরে তুই তারি রোকা আস্ত পাগল
কেটে বধ্‌রা অমন মস্ত ছাগল !"
হোরে বলে "তবে তার কি রকম ভাগ"
মোরে বলে "কেন ? বেশ রেখে জ্যান্ত ছাগ ;
ধর্, হইল ছাগের সামেটা আমার
আর অবশিষ্ট ভাগে তোর অধিকার।
সাম্‌নে পিছন্ নিয়ে এই হ'ল ভাগ।
পিছন পাইলি ব'লে করিস্‌নে রাগ।"
"না তাতে আর দোষ কি" হোরে বলে সুখে ;
নাকে চোখে খুসি মোরে চায় ফুল্লমুখে
ভাবে ভাগ্যিস হ'য়েছে সাম্‌নেটা তার,—
সাম্‌নেটা সকলের শোভার আধার ;
হোরে আড়ে হেসে চায় মোরেটার পানে
বলে, বড় মিঠে ভাব ছাগের বয়ানে ;—
আহ্লাদে আটখানা মোরে হয় তত
এদিকে চতুর হোরে ভাবে ইষ্ট কত,
প্রত্যুষে উঠিয়া দুধ খায় প্রতিদিন
দেখিয়া কাতর তবে মোরে দীনহীন
পেট ভ'রে দুধ খায় রোজ হোরে নিজে
মোরে হায় দেখে তাই শিশিরেতে ভিজে ;
এইরূপে কেটে যায় মোরে বেচারার
দেখে দেখে প্রাণখানি ফেটে যায় তার ;
ব'সে ব'সে খাবে দুধ হোরে মজা ক'রে
চরিয়ে খাইয়ে তারে সারা হবে মোরে

ভেবে ভেবে এই, হল বড়ই কাতর
হ'ল বড় রাগ তার হোরের উপর ;
থেকে থেকে আর মোরে নারিল সহিতে
একদিন হোরে যেই লাগিল দুহিতে,
ধরিল ছাগের, মোরে নাক মুখ চেপে,
তাধিয়া তাধিয়া লম্ফ দেয় ছাগ ক্ষেপে
ম্যাহ্যাহ্যা ম্যাহ্যাহা রবে আছাড়ি পাছাড়ি ;
সাঙ্গ হ'ল নাকো দোওয়া ছাগে দিল ছাড়ি,
দুয়েছিল যাহা হোরে, পড়ে গেল সব।
এখন দুজনে মিলে রহিল নীরব।
হোরে মোরে পানে চায় মোরে হোরে পানে
নারিল বুঝিতে দোঁহে বখরার মানে ;
ঠেকে শেষে দুজনার হ'ল বেশ ভাব
কহিল 'সদ্ভাব নৈলে ঘুচে না অভাব।'
অন্তরে পোষণ করি মন্দ অভিসন্ধি
বখরা করিতে গেলে ভেঙে যায় সন্ধি।
গুপ্ত বিষসম হ'য়ে নীরবে নীরবে
নির্জীব করিয়া ফেলে বখ্রাকারী সবে।
বিষম বখরা তাহে কলহ অশেষ
যতনে রাখিও মনে এ হিতোপদেশ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয় সঙ্গীত।

(প্রথম প্রস্তাব।)

ফলের অন্তরে যেমন বীজ, পুষ্পের অন্তরে যেমন পরাগ বা পুষ্পসার, মস্তকের মধ্যে যেমন মস্তিষ্ক, সেইরূপ জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে জাতি প্রাণ-রূপে বিরাজ করে। সেই হেতু জাতীয় সঙ্গীত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার জাতি কথাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। জাতি কথার মূলে আমরা জন ধাতু পাই; জন ধাতু হইতে জাতি কথা আসিয়াছে। মনুষ্যের জন্ম হইলেই সে একটী জাতি হইল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে একটি জাতি হইল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে একটি জাতি প্রাপ্ত হইল। মনুষ্যের জন্মের সুখ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতীয় প্রকৃতি গঠিত হয়; সেই জাতীয় প্রকৃতি হইতেই জাতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি। যে মনুষ্য যে জাতীয় তাহার সঙ্গীতও সেই জাতীয় হয়। ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তুল্য জাতির জাতীয় সঙ্গীত ব্রাহ্মণের প্রকৃতির মত। ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সম জাতির জাতীয় সঙ্গীত ক্ষত্রিয়ের মত। বৈশ্যের অর্থাৎ বৈশ্যতুল্য জাতির জাতীয় সঙ্গীত বৈশ্যের প্রকৃকির মত। এবং শূদ্রের অর্থাৎ শূদ্রসম জাতির জাতীয় সঙ্গীত শূদ্রের স্বভাবের মত। এই স্বভাবের অনুসারীই সকল সঙ্গীত হয়। জাতীয় সঙ্গীতও জাতীয় স্বভাবের অনুসরণ করে।

এই স্বভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতকেই সাধারণতঃ হিন্দুদিগের চারি বর্ণের ন্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। জাতীয় সঙ্গীতের এই চতুর্ব্বিধ ভাব আবার পরস্পরের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পুনরায় অভিনব সঙ্কর জাতীয় সঙ্গীত সমূহের সৃষ্টি করে। এইরূপে পৃথিবীতে জাতীয় সঙ্গীত সমূহ দেশে দেশে বিচিত্র আকার ধারণ করে। যেমন আদি ছয় রাগ হইতে মিশ্রনের বলে ছত্রিশ রাগিণী হইয়া পড়িয়াছিল, চিত্রে তিনটী বর্ণের পরস্পরের মিশ্রণে কত বর্ণের উৎপত্তি হইল, সেইরূপ জাতীয় সঙ্গীতের মূল আদি চারিটী ভাব হইতে কতরূপ জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতে পারে। ভাবকে কেহ আটকাইতে পারে না; এক জাতীয় লোকের ভাব অপর

জাতীয় লোকের ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেই তাহা জাত্যন্তরতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আরেক জাতীয় ভাব ধরিবার চেষ্টা করে। সুতরাং তাহার জাতীয় সঙ্গীতও অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রত্যেক জাতিরই জন্মার্জ্জিত এক এক প্রকৃতি থাকে, তাহার মধ্যে অন্য প্রকৃতি অনুপ্রবিষ্ট হইলেই তাহা জাত্যন্তর প্রাপ্ত হয়। পাতঞ্জলদর্শনে আছে ;—

"জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

প্রকৃতির আপূরণ অর্থাৎ অনুপ্রবেশ হেতু জাত্যন্তর পরিণাম।

জাতির এই জাত্যন্তর পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতেরও জাত্যন্তর পরিণাম ঘটে। এক জাতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতিতে অপর জাতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতির আপূরণ হইলেই তাহা সেই জাতীয় সঙ্গীত হইবার উপক্রম হয়। পাতঞ্জলের এই 'জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ' সূত্রটী বড়ই সার কথা। কথাটী প্রায় সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। বাস্তবিকই এই বিশ্বের বিচিত্র জাত্যন্তর পরিণামের হেতুই প্রকৃতির আপূরণ। এই প্রকৃতির আপূরণে জড়পদার্থও যেমন জাত্যন্তরে পরিণত হয়, জীবেরাও সেইরূপ জাত্যন্তরে পরিণত হয় ; মনুষ্যও দেবতা হইতে পারে আবার দেবতাও মনুষ্য হইতে পারে ; পশুও মনুষ্য ভাবাপন্ন হইতে পারে, আবার মনুষ্যও পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্রে দেখি অনেকটা ডারুইন তত্ত্ব গ্রথিত। ইউরোপের ডারুইন তত্ত্বের কত পূর্ব্বে ভারতে উক্ত তত্ত্ব একরূপ আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে! উক্ত দর্শন সূত্রটীকে অন্য বিষয়ের ন্যায় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বিষয়েও প্রয়োগ করিতে পারি। উক্ত সূত্রটীর প্রাণের মাঝে যেন মহা যুক্তি বিদ্যমান! অর্থাৎ সূত্রকার স্পষ্টই এই ভাবটী বুঝিতে পারিয়াছিলেন অভাব পূরণের পথ আছে। জাতীয় অভাব অপর জাতির দ্বারা দূরীকৃত হইবার পথ আছে— ...ন্ন জাতি অভাব হীন জাতির প্রকৃতির আপূরণ করিলেই অভাব ...ইয়া যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্গীতও বিজাতীয় ... আপূরণে যেন কতকটা জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে। একটা ...ষ্টান্ত দিই ; দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আমাদের বঙ্গের একটা শ্রেষ্ঠ জাতীয় ...রিলেই চলে। সেটা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত

জাতীয় সঙ্গীত "জয় ভারতের জয়।" এই 'জয় ভারতের জয়' গানটীতে 'জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় জয় ভারতের জয়' এই সব পদগুলিতে বিজাতীয় প্রকৃতি আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। জয় ভারতের জয় গানটী বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ জাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত। ঋষিদিগের বেদে যেমন দেবতাদের স্তবস্তুতি দেখা যায়, সেই রূপ এই গানটী ভারত মাতার স্তবস্তুতি—ভারতের যশোগান। ইহা অনেকটা সাত্বিক প্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত। কারণ গানটিতে ধর্ম্মের মহিমা নিনাদিত হইয়াছে—যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়। 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' এই কথাটি ঠিক। ধর্ম্মবলই প্রকৃত বল, ধর্ম্মের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ প্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত বিরাজ করে, কিন্তু ক্ষাত্রপ্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত ধর্ম্মের উপর সেরূপ নির্ভর করে না, সে শাস্ত্র বল অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রকে সে প্রকার না মানিয়া শস্ত্রবল বা বাহুবলকেই মুখ্য মনে করে। বঙ্গ ভাষায় এই ক্ষাত্র প্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত ধরিতে গেলে একমাত্র কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' জাতীয় সঙ্গীতকে মনে হয়। তাহার মধ্যে তিনি যোগ আরাধনার বলকে তূণীর কৃপাণের বলের নিম্নে ফেলিয়াছেন।

"জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম, যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।"

কবিবরের এই জাতীয় সঙ্গীতে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির উন্মাদ চাপল্য আ
ইহা রাজসিক প্রকৃতির জাতীয় সঙ্গীত। মদের ক্ষণিক উত্তেজনার
ইহাতে উত্তেজনা আছে বটে, তাহাতে তপ্ত করিয়া দেয় কিন্তু তাহার
আবার শৈত্য বা নিস্তেজ ভাব জাগে। কিন্তু সত্বগুণাক্রান্ত জাতীয়
ক্ষণিক তাপে তপ্ত নহে তাহা ধর্ম্মরূপ তপে তপ্ত। সে জানে
বলং ক্ষাত্র বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং।'

সকলেই বোধ হয় জানেন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ট ঋষির মধ্যে



কবিবর—হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

লইয়া মহা যুদ্ধ হয় তাহাতে বিশ্বামিত্র পরাভূত হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল ক্ষাত্রবল ব্রহ্মতেজের নিম্নে। তাহাকে ক্ষাত্রবলকে ধিকার দিতে হইয়াছিল; এবং ব্রহ্মতেজই শ্রেষ্ঠবল দেখিয়া তিনি ব্রহ্মতেজ লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে আমাদের এই ভারতকে অধিকারে রাখিয়াছেন তাহা আমার মনে হয় প্রধানতঃ ব্রাহ্মণোচিত তপোবলে এবং গৌণতঃ ক্ষাত্রতপোবলে। মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপো ক্ষাত্রস্য রক্ষণং।"

ইংরাজেরা আসিয়া আমাদের মোহান্ধকার তাঁহাদের পাশ্চাত্য নূতন দিব্য জ্ঞানালোকে দূর করাতে তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে আমরা মুগ্ধ ও বশীভূত হইয়াছি; এই কারণেই বলিতেছি ইংরাজেরা জ্ঞানরূপী তপোবলে আমাদিগকে অধিকারে রাখিয়াছেন।

এই ভারতে এত বিচ্ছিন্ন জাতি তথাপি ইংরাজের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন এক হইয়া রহিয়াছি। পূর্ব্বে ভারতে যেমন তপস্যাবলে এ উহাকে পরাভূত করিত এখনও তাহাই। তখন মনুষ্য লোকে কাহাকেও তপঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে দেখিলে দেবতারাও ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এখনও তাই। ইংরাজ আমাদিগকে বাস্তবিক ব্রাহ্মণের তপ যে জ্ঞান তাহাতেই ভারতকে এরূপ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন যে সে আলোকে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গবৎ কেহ পড়িবার উপক্রম করিতেছে, কেহ দূর হইতে স্থির হইয়া দেখিতে দেখিতে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। সেই আলোক পাইয়া মোহগ্রস্ত ভারতের যেন সংজ্ঞা লাভ হইতেছে। সেই আলোকটী যেন এখন ভারতের সংজ্ঞান বা ঐক্যমত দেবতা স্বরূপ হইয়া খ্যাতি পাইতেছে আর সমগ্র ভারত যেন সেই আলোকরূপী ঐক্যমত্য দেবতার স্তুতিতে মুগ্ধ হইয়া প্রাণের উল্লাসে এক মহা ঐক্যমত্যস্তব গাহিয়া উঠিতেছেন ;—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্ত মেষাং।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥

সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

"তোমরা সকলে একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কও, তোমরা পরস্পরে পরস্পরের মনকে একত্রে জানো, পূর্ব্বে দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগের উপাসনা করিতেন।

মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, ইহাদিগের চিত্তের সঙ্গে মন সমান হউক। আমি তোমাদিগের এক মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিতেছি এবং সমান হবি দ্বারা হোম করিতেছি।—

তোমাদিগের অভিপ্রায় সমান হউক, হৃদয় সমান হউক, তোমাদিগের মন সমান হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ কর।" *

কবে এই প্রাচীন ভারতের সংজ্ঞান স্তব বর্ত্তমানে ভারতে সংজ্ঞাদান করিবে? কবে এই বৈদিক সঙ্গীত, সমুদয় জাতি এক প্রাণ ও এক মত হইয়া সমস্বরে গান করিবে?

সংবনন ঋষির এই সংজ্ঞান বা ঐক্যমত্য বিষয়ক স্তবটী সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইলে মন্দ হয় না। এই স্তবটীকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করা উচিত। ইহা শুদ্ধ ভারতের কেন সমস্ত ভূভারতের অর্থাৎ পৃথিবীর এক মহাজাতীয় সঙ্গীত হইবার জিনিষ। ইহা সমুদয় মনুষ্যকে মহাপ্রেম মাঝে আনিবার বা দীক্ষিত করিবার এক মহা স্তব বা মহা জাতীয় সঙ্গীত। বৈদিক ঋষির এই স্তবটী মহাজাতীয় সঙ্গীতরূপে আমাদিগের রাগিণীতে বসাইয়া বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ইহা স্বরলিপি সবলিত হইয়া য়ুরোপীয় স্বরলিপিতে ইংরাজী পিস্ আকারেও প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই বৈদিক সূক্তটীর ঋষি সম্বনন, ইহার দেবতা বা বিষয় সংজ্ঞান বা ঐক্যমত্য।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম।

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম পৃথিবী মধ্যে এক অদ্বিতীয় শিক্ষালয়। ইংরাজদের ইহা একটী আদরের সামগ্রী। এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেখানে যত কিছু দ্রব্য থাকিতে পারে, কৃত্রিমই হউক, আর অকৃত্রিমই হউক, এখানে সে সকলের একত্র সমাবেশ। কালচক্রের অনিবার্য্য গতির বশবর্ত্তী হইয়া মানবজাতির মধ্যে কতদূর বিপ্লব হইতে পারে তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন এখানে রক্ষিত আছে। কোথায় সেই ইজিপ্ট, কোথায় সেই ফিনিসিয়া, কোথায় সেই রোম, যাহা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়া সুদূর বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যাহার সন্তানগণ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও বীর্য্যের ভূরি ভূরি পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি অদ্যাবধিও পর্ব্বত সদৃশ অটল হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারা এখন কোথায়? তাঁহাদের অস্তিত্বের বিষয় যদি সন্দেহ থাকে তাহা হইলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে যাইলে সে সন্দেহ আর থাকিবে না, তাঁহাদের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম সভ্য জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশেষ; যেখানে যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার এক এক খণ্ড ইহার পুস্তকাগারে রক্ষিত হয়। এতাদৃশ অসামান্য পুস্তক সঞ্চয় পৃথিবীতে অতি বিরল। ব্রিটিশ মিউজিয়মের মহত্বের যথার্থতা দূর হইতে উপলব্ধি করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেরূপ কুজ্ঝটিকাময় বারিসিক্ত লণ্ডন সহরে কিছুকাল অবস্থিতি না করিলে ভুবিখ্যাত ব্রিটিশ রাজধানীর গৌরব ও প্রধানত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না ব্রিটিশ মিউজিয়ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলা যায়। ইহার রক্ষিত দ্রব্য সমূহ এত অধিক যে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে পরিচিত হইতে হইলে সমস্ত জীবনেও তাহা সম্ভবে না। লণ্ডন মধ্যেই ইহার অনেকগুলি শাখা আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের অসংখ্য দ্রব্যগুলির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিবরণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তত্রস্থ পুস্তকালয়টীই ইহার আলোচ্য।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিস এর "জাতীয় পুস্তকালয়টী" (Bibliotheque Nationale) বাদ দিলে ব্রিটিশ মিউজিয়মের ন্যায় বৃহৎ পুস্তকালয় জগতে দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। ইহা বর্ত্তমান যুগে যাবতীয় বিস্ময়াবহ বিষয়ের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে। এই সুবিশাল বিদ্যামন্দিরে যুগপরম্পরাসঞ্চিত মনিষীগণের বিপুল জ্ঞানরত্নরাজী অতি সমাদরের সহিত রক্ষিত আছে। তথায় বিদ্যার্থীগণ পরলোকগত মহামান্য পণ্ডিত ধুরন্ধর দিগের সহিত নীরবে অসঙ্কুচিত চিত্তে আলাপাদি করিতে পারেন। তাঁহাদের অসামান্য প্রভাবের চিহ্ন আধুনিক জগতের চিন্তাস্রোতের মধ্যে চিরস্মরণীয়রূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহারাই এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতি প্রাচীন কালেরও দুর্ল্লভ জ্ঞানরাশির এক অমূল্য রত্নাগার—যাহার দ্বার জ্ঞানরত্নান্বেষণকারীদিগের জন্য সর্ব্বদাই প্রশস্ত ভাবে উন্মুক্ত। সভ্যতার ইহা এক অলৌকিক কীর্ত্তি—ইহার আবশ্যকতা ও উপকারিতার সীমা নাই। বর্ত্তমান ও অতীত কালের জ্ঞানী মহাজন দিগের ইহা এক অসাধারণ সম্মিলনমন্দির এবং এ স্থানে জ্ঞাতব্য যে কোন বিষয়ই হউক না কেন সকল বিষয়ে সহজেই তাঁহাদের সহায়তা পাওয়া যায়। বন্ধুবিহীন অসঙ্গতিপন্ন বিদ্যাভিলাষীদের ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর নাই। এ নিষ্ঠুর জগতের উৎপীড়ন ও যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া ইহার আশ্রয়াপন্ন হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদিগের সৎসঙ্গ লাভে যে শান্তি সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তাঁহারা আর কোন স্থানে এত সহজে পাইতে পারেন কিনা সন্দেহ। এখানে তাঁহারা কায়িক ও মানসিক সুখের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে জ্ঞানোপার্জ্জনও করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ফ্রান্সের "জাতীয় পুস্তকালয়" বাদ দিলে ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকালয় পৃথিবীর যাবতীয় বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। জাতীয় পুস্তকালয়ে পুস্তক সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী আছে বটে, কিন্তু ইহার পুস্তকাবলী এরূপ সুপ্রণালীতে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অভিলষিত পুস্তক সমুদায় এরূপ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে ব্রিটিশ মিউজিয়মকেই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। আবশ্যক হইলেই ইচ্ছানুযায়ী পুস্তকাদি না প্রাপ্ত হইতে

পারিলে তবে তাহার উপকারিতা কোথায়? এই হেতু ব্রিটিশ মিউজিয়ম সভ্য জগতের এত আদরণীয়। ইহার অসংখ্য পুস্তকরাশি একজন সামান্য ব্যক্তিরও করায়ত্ত। আবেদন করিলেই যে কোন পুস্তক হউক না কেন অত্যল্পকাল মধ্যেই আনীত হয়। লেখক যতকাল এই মিউজিয়মএর সংসর্গে ছিলেন তাঁহাকে এক দিবসও সার্দ্ধ অর্দ্ধ ঘণ্টাকালের অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। এরূপ কথিত আছে যে সমস্ত ইউরোপ মধ্যে যে দেশের যাহা মাতৃভাষা সে দেশের সে ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুস্তকালয়ের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে না। যেমন আশা করা যায় জর্ম্মাণ ভাষায় লিখিত পুস্তক সমূহ জর্ম্মাণীর কোন প্রধান পুস্তকালয়ে যত অধিক থাকিবে ইউরোপের আর কোন স্থানে একাধারে তদনুরূপ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা ভ্রম মূলক; ব্রিটিশ মিউজিয়মে জর্ম্মাণ গ্রন্থের সঞ্চয় এত অধিক যে প্রভূত বলশালী বিদ্যা-গৌরবান্বিত জর্ম্মাণি দেশেও একত্র সংগৃহীত এতগুলি গ্রন্থ কোন একটী মাত্র পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ইংরাজদের জ্ঞানচর্চ্চা, উদ্যম ও অর্থ বলের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে জাতি জ্ঞানালোকের জন্য এত উৎসাহবান, এত আগ্রহপূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ মনে অর্থ ব্যয় করিতেও সতত প্রস্তুত, সে জাতি বিদ্যা বুদ্ধিতে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ব্রিটিশ মিউজিয়মএর ইংরাজী পুস্তক সঞ্চয় দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আর কোন ভাষায় এতাধিক পুস্তক অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। বিজ্ঞানই হউক আর সাহিত্য হউক, শিল্পই হউক, আর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হউক, পার্থিব আর অপার্থিব বিষয়ই হউক যে কোন বিষয়ই হউক না কেন পুস্তক সংখ্যা এত অধিক যে আজীবন কেবল সেই একই বিষয়েই ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিলে তাহা শেষ করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা কি ইংরাজী ভাষার কম গৌরবের কথা!

পুস্তকালয়টী তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম, মুদ্রিত পুস্তক, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, তৃতীয় সাময়িক পত্রাদি বিভাগ। প্রথম বিভাগের পুস্তক সংখ্যা ষোল লক্ষেরও অধিক এবং এই স্থানেই ইহা শেষ নহে। প্রতি

বৎসর প্রায় ছচল্লিশ হাজার পুস্তক ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে যে গুলির কপি রাইট করা বা সত্ত্বরক্ষিত হয় তাহার এক এক খানি আইনানুযায়ী ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাপ্য। এতৎসত্ত্বেও এই বিভাগের উন্নতির কারণ অনেক আছে। ১৭৫৭ খৃঃ ইংলণ্ডাধীশ্বর দ্বিতীয় জর্জ অষ্টম হেনরির রাজত্বকাল হইতে রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক সঞ্চিত রাজপুস্তকালয়ে বহু মূল্যবান যত পুস্তক ছিল সমস্ত এই মিউজিয়মকে দান করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকানেক বড় বড় পুস্তকালয় ইহার সহিত একত্রীভূত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইংলণ্ডাধিপ তৃতীয় জর্জএর সঞ্চিত পুস্তকাবলী অতিশয় মূল্যবান। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎসমুদায় মিউজিয়মকে প্রদান করেন। এই সকল বহুমূল্য পুস্তক সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে প্রায় বিশলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহাদের বহু ব্যয়সাধ্য স্ব স্ব সম্পত্তির সহিত ঐ উন্নতমনা নৃপতি দিগের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নিজেদের বদান্যতা ও স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। যে সকল পুস্তক বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই তাহা ক্রয় করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী নাই। এইরূপে নানা কারণে পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কোন পুস্তক নাই যাহা প্রকাশিত হইলেই মিউজিয়মের সর্ব্বগ্রাহী গর্ভে আসিয়া পতিত হয় না।

এসিয়াটিক বিভাগে প্রাচ্য জগতের সকল ভাষাকেই সমাদরের সহিত যথেষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। একদিকে চীন দেশ ও জাপান, অপর দিকে ভারতবর্ষ ও তুর্কী সকলকেই সমান ভাবে আদৃত করা হইয়াছে। প্রাচ্য তত্ত্ববিৎ মহা মহোপাধ্যায়গণ প্রাচ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শাস্ত্রাদি অনুশীলন করণার্থ ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুস্তকের এই মহা সম্মিলনীতে বেচারী বঙ্গভাষাকেও এক অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার পুস্তকের তালিকা বৃহদাকার। তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে সকল প্রকারেরই বাঙ্গলা পুস্তক আছে। বটতলার ছাই ভস্ম হইতে বঙ্গবাসীর আদৃত কালীপ্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত মহাভারতের ন্যায় সারবান পুস্তকাদি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।



ব্রিটিশ মিউজিয়ম্।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আধুনিক বঙ্গকবিচূড়ামণিদের সমগ্র গ্রন্থাবলী সেখানে দেখিতে পাইলাম না। শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর মধ্যে অতি সামান্য মাত্র রক্ষিত আছে। বঙ্গীয় লেখক লেখিকারা যদ্যপি তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলির এক এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মকে দান করেন তাহা হইলে উভয়েরই সুবিধা, কেননা, পাঠকগণ তাঁহাদের নিকট বাধিত থাকেন অথচ তাঁহাদের পুস্তকগুলি চিরকালের জন্য সুরক্ষিত থাকে। যদ্যপি কোন কারণ বশতঃ সমস্ত পুস্তকগুলিই বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে একখানি নিশ্চয়ই সেখানে থাকিবে। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর পরিবর্ত্তে বটতলাকে কিছু বেশী পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া কেন হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না।

পাণ্ডুলিপি বিভাগটীও মুদ্রিত পুস্তক বিভাগ অপেক্ষা আবশ্যকীয়তায় কোন অংশে ন্যূন নহে। এই বিভাগের সঞ্চয় বহুকালব্যাপী—খৃষ্টের জন্ম-কালের দ্বিশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ। এখানে ইংরাজ দিগের বিখ্যাত স্বাধীনতাপত্র (Magna Carta) যাহা ইংলণ্ডাধীপ জন্ ১২১৫ খৃঃ অব্দে প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্য-মান আছে। সুবিধা হইলেই বিখ্যাত লেখক লেখিকাদিগের পাণ্ডুলিপি গুলি বহু ব্যয়সাধ্য হইলেও ক্রয় করা হয়।

সাময়িকপত্র বিভাগটীও বহু বিস্তৃত ও অতিশয় মূল্যবান। এখানে দৈনিক হইতে বাৎসরিক সংবাদপত্র প্রভৃতি যত প্রকার সাময়িকপত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় তাহা একাধারে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। পাঠকেরা এই থেকে অনুভব করিতে পারিবেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের ব্যাপার-খানা কিরূপ গুরুতর।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম'এর পাঠ্য বিষয়ের সংগ্রহ যেমন বিস্ময়কর ইহার তালিকা পুস্তকের কলেবরও তেমনি ভয়াবহ। ইহা পার্চ্চমেণ্ট কাগজ নির্ম্মিত ও খুব দৃঢ়রূপে বাঁধাই। পাছে অনবরত ঘর্ষণে উহার তলদেশ ছিন্ন হইয়া যায় সেজন্য ঐ ভাগটা পিতলের পাতদ্বারা মণ্ডিত। গ্রন্থকার ও পুস্তকের নাম একখণ্ড ভিন্ন কাগজে মুদ্রিত করিয়া তাহা তালিকা পুস্ত-কের পার্চ্চমেণ্ট পত্রে আঁটিয়া দেওয়া হয়। নূতন পুস্তকের জন্য তালিকার মধ্যে যথেষ্ট স্থান রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ এই হেতুই ইহার কলেবর

এত বৃহৎ। কর্ত্তৃপক্ষরা সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ইহাকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করা যায়। এক্ষণে একটী নূতন তালিকা পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে, তাহা হয়ত বৃহদাকার বিশিষ্ট ৬ শত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে এবং তাহার মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আগামী বর্ষমধ্যে শেষ হইতে পারে। ইহার আয়তন যে কত বৃহৎ এইরূপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারা যায়। ইহাতে কেবল এক স্মিথ নামক ২৪০০ শত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু তাহাই নহে; এক নামের আরও কত শত গ্রন্থকার আছে। ইহাদের প্রত্যেকটী যদি অন্ততঃ ৪ খানি করিয়া পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই পুস্তক সকলের সমষ্টি কত হইবে পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম'এর পাঠাগারটী সম্পূর্ণ গোলাকৃতি ও মিউজিয়ম প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে স্থিত। ছাদটী গম্বুজ বিশিষ্ট এবং আয়তনে ১০৬ ফুট উচ্চ আর ১৪০ ফুট চওড়া। গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিলে বিস্ময় বিহ্বল হইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ প্রকার গম্বুজ বিশিষ্ট বৃহদায়তনের হর্ম্ম্য পৃথিবীতে অতিশয় বিরল। ইহার মধ্যে পাঠক পাঠিকারা আরাম করিয়া বসিয়া যাহাতে মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন কার্য্য করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্তের জন্য বুদ্ধি ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করা হয় নাই। মধ্যস্থলে তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)এর আফিস সেখানে তিনি ও তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারীরা পাঠকাদিগের আজ্ঞাধীন হইয়া সর্ব্বদাই উপস্থিত আছেন। আফিসকে বেষ্টন করিয়া চারিধারে তাক, বুক্ সেল্‌ফ আছে, সে গুলি সুবৃহৎ তালিকা পুস্তক ও সচরাচর আবশ্যকীয় পুস্তকাবলীতে পূর্ণ। সেখান হইতে পাঠ করিবার টেবিলগুলি চক্রের অর এর ন্যায় লম্বভাবে সজ্জিত। এরূপ বন্দোবস্ত হেতু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের পক্ষে পাঠকবর্গের উপর দৃষ্টি রাখিবার বিশেষ সুবিধা। টেবিলের উভয় পার্শ্বস্থ পাঠকদিগের মধ্যে চর্ম্মাচ্ছাদিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত দেওয়াল ব্যবধান আছে তাহাতে তাঁহারা পরস্পরকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের প্রত্যেকের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক টেবিলে একটী করিয়া দোয়াত, দুইটী কলম, একটী কাগজ চাপা, একটী কাগজ কাটা ছুরী ও

ব্লটিং পেপার আছে। তদ্ব্যতীত লিখিবার ও পড়িবার সময় পুস্তক রাখিবার জন্য একটী কৌশল নির্ম্মিত পুস্তকাধারও (Folding bookrest) আছে, তাহাতে আপন সুবিধামত পুস্তক রাখিয়া পাঠক আরাম-চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ ইচ্ছা পড়িতে পারেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাঠাগারে আলোকের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, কেবল দিবাভাগেই পাঠকবর্গ অধ্যয়ন কার্য্য করিতে পারিতেন সেই জন্য শীত ঋতুতে অতি অল্পকাল মাত্র পাঠাগার খোলা থাকিত। কিন্তু এক্ষণে সে অভাবটী দূরীকৃত হইয়াছে; কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত তাঁহারা উজ্জ্বল তড়িতালোকে ইচ্ছামত পড়িতে পারেন। প্রত্যেক পাঠকের টেবিলে একটী করিয়া বৈদ্যুতিক ল্যাম্প আছে এবং তন্নিম্নে তাঁহাদের হিমক্লিষ্ট পদতল উত্তপ্ত রাখিবার জন্য ষ্টীম পাইপ এরও বন্দোবস্ত আছে। পাঠকবর্গের আরামের জন্য অনুষ্ঠানের ক্রটী নাই।

পাঠাগারের ভিতরের দেওয়ালটী অনেক উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বইয়ের শেল্ফ্এর দ্বারা পূর্ণ—সে গুলি তিন থাকে বিভক্ত। নিম্ন থাকটীতে কেবল বিখ্যাত গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থাবলী, বড় বড় শিক্ষা সমিতি ও বিজ্ঞান সমিতির বাৎসরিক বিবরণী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র ও সাধারণের সচরাচর আবশ্যকীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলী আছে। এ পুস্তকগুলি পাঠক বিনা অনুমতিতে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। পাঠাগারের একটী করিয়া চিত্র প্রত্যেক টেবিলে সংলগ্ন আছে। ঐ চিত্রে ঐ পুস্তকগুলি নম্বর সহ সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করা আছে। ঐ চিত্রের সাহায্যে পাঠক সত্বর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া তাঁহার আবশ্যকীয় বস্তু পাইতে পারেন। যে পুস্তক পাঠকের আয়ত্তাধীনে নাই তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। যদি গ্রন্থকারের নাম স্মরণ থাকে তাহা হইলে পাঠক তালিকা পুস্তক হইতে অভিলষিত পুস্তকের নাম ও নম্বর লইয়া একখণ্ড মুদ্রিত কাগজে লিখিবেন পরে তাহাতে আপন নাম ও টেবিলের নম্বর লিখিয়া ঐ কাগজ খণ্ড সমীপবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট চুবড়ির (Basket) মধ্যে রাখিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রার্থিত পুস্তকগুলি কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাঁহার অধিকৃত টেবিলে প্রেরিত হইবে—তাঁহাকে পুস্তকের জন্য

অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। কিন্তু অধ্যয়ন কার্য্য শেষ হইলে পাঠককে স্বহস্তে পূর্ব্বোক্ত পুস্তকাদি লইয়া যাইয়া প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যতক্ষণ না তিনি কাগজখণ্ডগুলি ফিরাইয়া পান ততক্ষণ তাঁহাকে পুস্তক গুলির জন্য দায়ী থাকিতে হইবে। পাঠকের গ্রন্থকারের নাম স্মরণ না থাকিলে তাঁহাকে বিষয়-তালিকাপুস্তক (Subject catalogue) দেখিতে হইবে। ইহাতে এক এক বিষয়ের উপর যত উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহার তালিকা আছে। কিন্তু ইহাতে সমগ্র পুস্তকাবলীর নাম নাই কেননা ইহা প্রত্যেক পঞ্চমবর্ষে প্রকাশিত হয়। মিউজিয়মে যখনই কোন নূতন পুস্তক আইসে তখনই তাহা সাধারণ তালিকা পুস্তকভুক্ত করা হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের নাম জানা থাকিলে পাঠক ঐ নূতন গ্রন্থও পড়িতে পারেন।

প্রাচ্যগ্রন্থ ও ব্রিটিশ সংবাদপত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠাগার আছে। সাধারণ পাঠাগারটীতে কেবল ইউরোপীয় পুস্তকাবলী ও পাণ্ডুলিপি আছে। পাঠকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে আরও স্বতন্ত্র পাঠাগার না করিলে অনেককে স্থানাভাব বশতঃ ফিরিয়া যাইতে হয়। বেলা দশটার মধ্যে না যাইতে পারিলে বসিবার স্থান পাওয়া যাইবে কিনা তাহার কোন নিশ্চয় নাই। বেলা বারটার পূর্ব্বেই পাঠাগারের সমস্ত বসিবার স্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া যায়। তিন শতাধিক পাঠক পাঠিকা তখন নিবিষ্ট চিত্তে জ্ঞানোপার্জ্জনে রত। এতগুলি লোকের একত্র সমাবেশ হইলেও স্থানটী শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ। তখন দেখিতে পাওয়া যায় বড় বড় পণ্ডিতগণ নিঃশব্দে পুস্তকাদি রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের মধ্যে কেবল বৈদ্যুতিক আলোকই জ্বলে। পাছে অগ্নিকাণ্ড হয় এই ভয়ে আর কোন প্রকারের আলোকের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এত সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে কিছুতেই ইহা দগ্ধ হইতে পারিবে না—বলিতে গেলে তাহার মধ্যে দাহ্য পদার্থ কিছুই নাই। পুস্তক রাখিবার আলমারীগুলি লৌহ নির্ম্মিত ও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত।

মিউজিয়মের পুস্তকাগারের পাঠক হওয়া বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার

নহে। ইংলণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যাঁহার নিজ গৃহ সম্পত্তি আছে তাঁহার সুপারিশ পত্রসহ পুস্তকালয়ের প্রধান অধ্যক্ষকে আবেদন করিতে হইবে। আবেদন পত্র গ্রাহ্য হইলে আবেদনকারীকে একটী টিকিট দেওয়া হয়। সেই টিকিটের দ্বারা আবেদনকারী প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকেন। টিকিটটী প্রত্যেক ৬ মাস অন্তর বদলাইয়া নূতন করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা কেবল পরীক্ষার জন্য পাঠাভ্যাস অথবা আমোদের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। যাঁহারা কোন বিশেষ বিদ্যা বিষয়ে অনুশীলন করিতে চান ব্রিটিশ মিউজিয়ম তাঁহাদেরই সাহায্য করিবার জন্য হইয়াছে, সাধারণের আমোদের জন্য হয় নাই। নূতন নভেল প্রকাশিত হইলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হয় না, পরে পড়িবার আবশ্যক হইলে পড়িবার উদ্দেশ্য জানাইতে হইবে। অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে চাহিবামাত্র পাইবার পক্ষে কোন আপত্তি নাই।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠক হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। অসংখ্য পুস্তকরাশি তাঁহার করায়ত্ত। পুস্তকের প্রথম সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সমস্তই তিনি ইচ্ছা করিলেই পাঠ করিতে পারেন। পুস্তক রচনা করিবার এমন সুবিধা অতি বিরল। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন সকল বিষয়েরই উপর রাশি রাশি গ্রন্থ আছে। যাঁহার যত আবশ্যক তিনি তত নব নব জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিদ্যামন্দিরে ধনী ও দরিদ্রে কোন প্রভেদ নাই। জীর্ণবস্ত্র পরিহিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত কপর্দ্দকহীনের ও বহুমূল্য পরিচ্ছদভূষিত লক্ষপতির সমান আদর। যেমন ওয়েষ্টমিনিষ্টর অ্যাবিতে প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও তাঁহার হীনবল সামান্য প্রজা শান্তিসুখে ও মিত্রভাবে অনন্তকালের জন্য একত্র শয়ন করিয়া আছেন এই বিদ্যামন্দিরেও তেমনি ধনী নির্ধনী, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, উচ্চ নীচ সকলেই জীবনকালে পরস্পরের সঙ্গসুখ একত্রে উপভোগ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে উজ্জ্বল তড়িতালোক বিস্তৃত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছে, যেখানে পরলোকগত মহাজনেরা যেন অমর শরীরে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সেখানে শত শত নরনারী নির্ব্বাক হইয়া আন্তরিক আগ্রহ

সহকারে কার্য্য করিতেছে এবং যেখানে এখন অনেক মহাজন রহিয়াছেন যাঁহারা জ্ঞানজগতে চিরকালের জন্য আপনাদিগের চিহ্ণ অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যাইবেন বাস্তবিক সেই ব্রিটিশ মিউজিয়ম মধ্যে বসিয়া পাঠ করা কি অপূর্ব্ব সুখভোগ তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব নিকেতন।
বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর;
সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব সরাচর।
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়;
উপমা রহিত, সর্ব্বজন হিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ।
অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।
নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে যাঁর।
জলবিন্দুপরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার।
পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেইরূপে সব রয়।
তাহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবনদাতা।
রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্বপাতা।
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যার নিয়মেতে।
সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে।

১ II সা গা গা। গা২ গা গা। গা২ পা গা।

— II নি ত্য নি। র ঞ্জ ন। নি খি ল।

গা২ গা গ্‌মা। রে গা গা গা। গ্‌পা মা মৃপা মা। গা৩

কা র ণ। — বি ভু বি। শ্ব — নি কে। ত

রে। র্‌গা রে সা II। (স্থা) :— + সা ধা নি নি।

—। — — ন II। (স্থা) :— — বি কা র।

২...

সা সা সা সা। + সা সা সা সা। নি ধা২ পা২

বি — হী ন। — কা ম ক্রো। ধ — —

২......... ২............ ২

প্‌সা সা। নি সা সা সা। নি ধা২ পা২ পা ধা। ধ্‌সা

হী —। —ন্ নি র্বি শে। ষ — — স না। ত

২

ন্‌সা নি২ ধা২ নি। ধ্‌পা + পা গ্মা গা। রে২ সা২

— — — —। — — ন —। — —

প্রথম দ্বিতীয়

"(স্থা-পূ)" অথবা "(ভো-প্র)" সা পা গা। গা২ গা গা।

"(স্থা-পূ)" অথবা "(ভো-প্র)" অ না দি। অ ক্ষ র।

পা প্‌পা পা পা। পা পা পা পা। প্‌নি ধা পা পা।

— পূ র্ণ প। রা ৎ প র। — অ ন্ত রা।

ম্পা মা ম্পা মা। গা গা গা রে। গা রে সা সা। সা
স্বা— — অ গো। চ — — —। — — র সা। —

২..
পা নি নি। সা + সা সা + সা। + সা সা সা সা।
স র্ব্ব শ। ক্তি — মা —। —ন্ স র্ব্ব ত্র।

২............ ২............
নি ধাই পাই প্সা + মা। নি মা মা গা। নি ধাই
— — — মা মা। ন্ ব্যা প্ত স। র্ব্ব —

২ ২
পাই পা ধা। ধ্সা ন্সা নিই ধাই নি। ধ্পা + পা মা
— চ রা। চ — — — —। — — র

গা। রেই সাই (স্থা-পু) সা গা গা। গাঃ
—। — — (স্থা-পু) নি ত্য নি। র

অপর আভোগ গুলি প্রথম আভোগের মত।

প্রথম আভোগ = "অনাদি অক্ষর" হইতে "ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর" পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় আভোগ = "অনন্ত অব্যয়" হইতে "সর্ব্বাশ্রয়" পর্য্যন্ত

তৃতীয় আভোগ = "সর্ব্বজ্ঞ নিকল" হইতে "অবিনাশ" পর্য্যন্ত।

চতুর্থ আভোগ = "নক্ষত্র তপন" হইতে "চমৎকার" পর্য্যন্ত।

পঞ্চম আভোগ = "পশু পক্ষী নানা" হইতে "সব রয়" পর্য্যন্ত।

ষষ্ঠ আভোগ = "আহার উদরে" হইতে "বিশ্বপাতা" পর্য্যন্ত।

সপ্তম আভোগ = "জন্ম স্থিতি ভঙ্গ" হইতে "বিবিমতে" পর্য্যন্ত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।



ইঞা গণপতির বন্দনা এবং বিসর্জ্জন।

ইঞারে প্রণমি! ইনি গণেশ ঠাকুর!
নাক দিয়া বাহিরয় বাজখাঁঞি সুর॥
চবর্গের দেউড়িতে ভোঁ হইয়া বসি,
ইঞা ইঞো করিছেন গঞ্জিকায় রসি॥
কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, ছড়াইয়া ঠ্যাঙ,
ভাবে ভোর হঞিয়া ডাকেন কোলা ব্যাঙ॥
চৈতন্য-চরিতে দে'ন মাঝে মাঝে ডুব।
হ'ঞা খা'ঞা পেয়ে তথি আড্ডা জমে খুব॥
কেন হেন কর্ম্মভোগ, ঘরে যা'ন চ'লে।
ন মিশিবে চএ জএ, আবশ্যক হ'লে॥

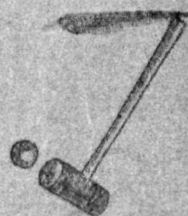
দেখ চেয়ে;—

বন্‌চিত = বঞ্চিত। বান্‌ছা = বাঞ্ছা।

যাচ্‌না = যাজ্ঞা। যজ্‌ = যজ্ঞ।

অর্থাৎ

লিখ্‌ব "যাচ্‌না" প'ড়্‌ব "যাজ্ঞা"।
লিখ্‌ব "যজ্ঞ" পড়্‌ব "যজ্ঞ"।
ভাজ্‌ব "ঝিঙ্গা" ব'ল্‌ব "পটল"।
চিরকালই তাই ক'রে আস্‌চি—
নূতন কিছুই না! তার সাক্ষী
লিখি "যজ্ঞ" বলি "যগ্‌গঁ"।
লিখি "দেখ" বলি "দ্যাখো"।
লিখি "নীচে" বলি "নিচে"।



শূন্য-দূরীকরণ।

শবদের অন্তে মাঝে 'য-ড-ঢ'র মুখে,
বেরো'য় 'য়-ড়-ঢ়' বুলি, শ্লেষ্মা জমি' বুকে।
জানো যদি, তবে কেন শূন্য দেও নীচে॥
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে!
নবোঢাই তো নবোঢ়া, ঘোড়াই তো ঘোড়া।
এ ছার
ঘোড়ার ডিম অনর্থের গোড়া॥
ময়ূর মজুর নহে, কার্ত্তিকে সে বহে।
"গয়া" তীর্থ-নিকেতন, "গজা" কভু নহে॥
কি আমি লিখিনু নিচে, চেঁচাইয়া পড়',
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড়॥

পাঠ।

আষাঢ়ে ঢাকিল নভো পয়োধর জালে।
বায়স উড়িয়া বসে ডালের আড়ালে॥
খুলিয়া খড়ম জোড়া, খাটিয়ায় পাশ মোড়া,
দিতে দিতে চক্ষে এ'ল ঘুম।
ঘরে ঢুকি ভৃত্য ছোঁড়া, ঘড়ি মোর সোণা মোড়া,
হাতাইল দিব্য বেমালুম॥

V বিসর্জ্জন।

কহিনু বর্ণমালীরে ডাকি নিরালায়,
"কলহ পুষিছ কেন বরণ-মালায়?
এক বএ বস্ আছে! দুই ব কিজন্য?"
এত শুনি বর্ণমালী হইল বিষণ্ণ॥
বলিল বিবর্ণ মুখে "রেখাচার্য্য দাদা!
অন্তস্থ বএর তুমি জান না মর্য্যাদা!
সে যে ব বেদের মূল, সুবর্ণের সার।
ইংরাজি Vএর মত উচ্চারণ তার॥"
আমি বলিলাম "ওহে বর্ণমালী ভায়া!
অন্তস্থ বএর লাগি মিছে হেন মায়া!
পণ্ডিত শেখায় যাহা, ছেলে তাই শেখে।
'বিক্টোরিয়া' না লিখিয়া 'ভিক্টোরিয়া' লেখে॥
পশ্চিমে Vএর বুলি দিব্য আছে খাঁটি।
বঙ্গের মাজ্রি গুণে হইয়াছে মাটি॥"
এত শুনি বর্ণমালী সুরু করি কান্না,
বলে 'বস্ করো দাদা! হইয়াছে! আন্না!'

উঠিয়া তখন আমি সুযোগ নিরখি'
(বর্ণমালা যত বলে 'কর কি ! কর কি !')
বর্ণমালা পিঞ্জরের খুলি দিনু দ্বার।
অন্তস্থ ব উড়ি গেল রাজ্যে আপনার॥

(ক্রমশঃ)

রসভোগ সন্দেশ।

উপকরণ।—ছানা একসের, দোবরা চিনি আধ সের, জল পাঁচ ছটাক। এই কয়টী সন্দেশের উপকরণ।

শুক্না রাবড়ি আধ সের, মেওয়া (ডেলাক্ষীর) আধ পোয়া, পেস্তা আধ ছটাক, বাদাম আধ ছটাক, ছাড়ান খরমুজের বীচি (ইহা না দিলেও চলে) এক ছটাক, ছোট এলাচ আধ ছটাক, গোলাপী আতর দু দিন কৌটা, গোলাপজল আধ ছটাক এই গুলি পুরের উপকরণ।

সন্দেশের উপরে ও নীচে বসাইবার জন্য দেড় পোয়া শুক্না মালাই।

প্রণালী।—শুক্না রাবড়ি আনিয়া আঠার টুকরা করিয়া কাট। ছোট এলাচের দানা বাহির করিয়া আধ-কোটা করিয়া রাখ। পেস্তা, বাদাম ভিজাইয়া তাহার খোসা ছাড়াইয়া আড় ভাগে কাটিয়া রাখ। কেবল ইহা হইতে দু চারিটী পেস্তা ও বাদাম আলাদা করিয়া রাখিয়া দিবে এই গুলি পরে আবশ্যক হইবে।

একটি পাত্রে ডেলাক্ষীর হাতে করিয়া গুঁড়াইয়া রাখ। তাহার সহিত পেস্তা ও বাদাম কুচি, খরমুজের বীচিগুলি, ছোট এলাচ গুঁড়া, গোলাপজলও গোলাপী আতর সব একত্রে মিশাইয়া আঠারটী নাড়ু পাকাইয়া রাখ। ইহার এক একটী নাড়ুর চারিধারে ভাগ করা শুক্না রাবড়ির এক একটী টুকরা লইয়া আবৃত কর এবং হাতে চাপিয়া চাপিয়া বাঁধ। তাহা হইলে আর

খুলিয়া যাইবে না। এই প্রকারে সব গুলি করিয়া রাখ। এই গুলি সন্দেশের ভিতরে পুর দিতে হইবে।

এখন সন্দেশ প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্বদিন রাত্রে কিম্বা যেদিন করিবে তাহার সকাল বেলায় একটি কাপড়ে ছানা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ। ছানার সমুদয় জল ঝরিয়া যাইবে। তারপরে বারকোষের উপরে ছানা ঢালিয়া ফেল; এবং হাতে করিয়া মোলায়েম করিয়া যাড়িয়া রাখ।

একটি কড়া করিয়া আধ সের দোবারা চিনিতে পাঁচ ছটাক জল মিশাইয়া চড়াইয়া দাও। মিনিট দশ পরে ফুটিয়া উঠিলে পর ঝাঁঝরি করিয়া গাদ ছাঁকিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। রস চড়াইবার প্রায় মিনিট কুড়ি পরে যখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে এবং কাটা কাটা হইয়া যাইতেছে দেখিবে তখন তাড়ু দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। রসটা যখন গাঢ় হইয়া আসিল দেখিবে তখন ছানা ছাড়িবে। ক্রমাগত তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাক। রসের সহিত ছানা একেবারে মিশিয়া যাইবে। মিনিট কুড়ি কি পঁচিশ পরে যখন দেখিবে ক্রমে যেন ভারী হইয়া আসিতেছে তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দিবে। ইহা মধ্যম আঁচে করিয়া তারপরে নরম আঁচে করিতে হইবে।

সন্দেশের ভিতরে পুর ভরিয়া গোল্লা প্রস্তুত কর।

এবারে মালাই খানি দুই কি দেড় ইঞ্চি পরিমাণে চতুষ্কোণ আকারে ছত্রিশ টুকরা করিয়া কাট। এক একটি সন্দেশের উপরে ও নীচে এক একখানি মালাই বসাইয়া দাও। যে পেস্তা ও বাদাম গুলি আলাদা রাখা হইয়াছিল সেই গুলি লম্বা দিকে কুচি কুচি কর। সন্দেশের উপরে দু তিনটা করিয়া এই পেস্তা ও বাদাম কুচি সাজাইয়া দাও।

ইহাতে প্রায় দু সের আধ পোয়া সন্দেশ হইবে।

ব্যয়।—ছানা আট আনা কি বার আনা (সব সময় দাম ঠিক থাকে না), চিনি দুই আনা, রাবড়ি ছয় আনা, মেওয়া দুই আনা, পেস্তা ছয় পয়সা, বাদাম চার পয়সা, খরমুজের বীচি পাঁচ পয়সা, ছোট এলাচ চার আনা, মালাই আট আনা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দু টাকা দু আনা লাগিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

করমচার হিন্দুস্থানী আচার।

উপকরণ। করঞ্চা আধসের, মেতি আধ ছটাক, কালজীরা আধ ছটাক, মৌরী আধ ছটাক, রস্থন দুইটা (রস্থন ইচ্ছামত না দিলেও চলে). রাই সরিষা এক কাঁচ্চা, শুক্না লঙ্কা আটটা, নুন আধ ছটাক, হলুদ দুই গিরা, সরিষা তৈল একসের।

প্রণালী।—করমচা গুলি গোটা থাকিবে অথচ চিরিতে হইবে। একটি সরু কাটি করিয়া ইহার সব বিচিগুলি বাহির করিয়া ফেল।

মেতি, কালজীরা ও মৌরী কাট খোলায় চমকাইয়া (অর্থাৎ শুক্না খোলায় বা তাওয়ায় অল্প ভাজা ভাজা করিয়া) কুটিয়া রাখ। রস্থন বাঁটিয়া রাখ। লঙ্কা, হলুদ এবং সরিষা গুঁড়াইয়া রাখ। এবারে সব মশলা একত্রে মিশাও।

একটি বুয়েমে বা কাচের মুখ বড় শিশিতে অথবা মাটির হাঁড়িতে প্রায় দেড় আঙ্গুল কম করিয়া তেল ঢাল। তেলে অর্দ্ধেক নুন (এক কাঁচ্চা) দাও, অর্দ্ধেক করমচা (এক পোয়াটাক) দাও। এবারে লঙ্কা সরিষা প্রভৃতি মিশান মশলা দাও। তারপরে করমচা দাও। সব উপরে অবশিষ্ট নুন টুকু দিয়া বুয়েমের ভাল করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রৌদ্রে দাও। একমাস রৌদ্রে দিলে তবে খাইবার উপযুক্ত হইবে। এই করমচা ফুরাইয়া গেলে এই তেলে আবার করমচা দিতে পার।

ইহা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে প্রস্তুত করিতে হয়।

ব্যয়।—আনা আটেকের ভিতরেই হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

আলুর চপ।

উপকরণ।—আলু তিন পোয়া, কিমা মাংস এক পোয়া, পেঁয়াজ আধ ছটাক, পার্শ্লি সেলেরি (বাগানে মশলা) শাক দুতিন ডাল, * কাঁচালঙ্কা চার পাঁচটী, তেজপাতা দুটি, ময়দা এক কাঁচ্চা, নুন প্রায় পোন তোলা, গোল-মরিচ গুঁড়া সিকি তোলা, গরম মশলার গুঁড়া (দুটো ছোট এলাচ, তিন চারিটা লঙ্গ, একটু দারচিনি গুঁড়াইয়া লইবে) দুয়ানি ভর, ঘি তিন ছটাক, ডিম একটা, থাস্তা বিস্কুট (অর্থাৎ যে বিস্কুট গুঁড়ান যায়, নরম নয়। মিষ্টি বিস্কুট হইলে চলিবে না।) এক পোয়া।

প্রণালী।—পেঁয়াজ, বাগানে মশলা ও কাঁচালঙ্কা কিমা অর্থাৎ খুব কুচি কুচি করিয়া রাখ। বিস্কুট গুলি গুঁড়াইয়া একটি থালার স্থায় চেপ্টা পাত্রে রাখিয়া দাও।

একটি হাঁড়িতে পাঁচ পোয়া জল দিয়া আলুগুলি সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া দাও। মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরে আলুর মুখ ফাটা ফাটা হইয়া গেলে বুঝিবে ঠিক রকম সিদ্ধ হইয়াছে, তখন নামাইয়া জল ঝরাইয়া ফেলিবে। আলুর খোসা ছাড়াইয়া ফেল। তারপরে একটি গাঢ় পাত্রে অথবা কলাই করা হাঁড়ির (ষ্টু প্যান) ভিতরে রাখিয়া একখানি কাঠের হাতার পশ্চা-ভাগ দিয়া মোলায়েম করিয়া মাড়িয়া রাখিয়া দাও। আলু যে হাতে করিয়া মাড়া যায় না তাহা নহে, যত পরিষ্কার ভাবে কাজ করা যায় ততই ভাল। পাচকেরা অনেক সময়ে হাত ভালরূপে না ধুইয়া অপরিষ্কার ভাবে কাষ করিয়া থাকে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও হাতা প্রভৃতি কোন একটা ব্যবধানের দ্বারা আলু প্রভৃতি মাড়া নিয়ম।

কিমা মাংস লইয়া আগে একবার ছুরি দিয়া খুড়িয়া লও। তারপরে মাংসের ভিতরে যে সব রগ (চর্ব্বি ও শাদা সুতার স্থায় শিরাদি) থাকিবে বাহির করিয়া ফেলিবে। এই রগ বাছিয়া না ফেলিলে খাইবার কালে মুখে লাগিবে।

---

* টেরিটি বাজার বা হক সাহেবের বাজারের 'বাগানে মশলা' বলিলেই দিবে।

একটি তৈয়ে বা ফ্রাইপ্যানে (এই সকলের অভাবে কড়ায়) এক ছটাক ঘি চড়াইয়া দাও। ঘিয়ে তেজপাতা ছাড়। দু তিন মিনিট পরে কিমা পেঁয়াজ, বাগানে মশলা ও কাঁচালঙ্কা ছাড়। তিন চার মিনিটের ভিতরে এই গুলি ঘিয়ে ভাজা ভাজা হইয়া আসিলে মাংস ছাড়িবে। খুন্তি দিয়া নাড়িতে থাক। মিনিট পাঁচ নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে ইহার জল মরিয়া আসিয়াছে চারিদিকে মাংস গোল করিয়া দিয়া মধ্যস্থলে ময়দা টুকু ছাড়। নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে ময়দা লাল হইয়া আসিয়াছে তখন সব মাংসটা ময়দার সহিত মিশাইয়া ফেল। এক ছটাক জল দাও। দু তিন মিনিট পরে জল মরিয়া যাইলে পর গোলমরিচ গুঁড়া ও নুন ছাড়। তিন চারবার নাড়িতে নাড়িতে ভাজা ভাজা অথচ রস রস হইয়া আসিলে গরম মশলার গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া নামাও। ইহাই আলুর চপের পুর প্রস্তুত হইল।

এবারে মাড়া আলুতে সিকি তোলাটাক নুন মিশাও। তারপরে লুচির নেচি কাটার ন্যায় কুড়িটা নেচি কাট। প্রত্যেক নেচি লইয়া হাতে করিয়া পাতলা ও চেপ্টা গড়ন কর (অনেকটা বাদামী বা দীপ শিখার গড়নের ন্যায় হইবে যাহাকে চিরাগী গড়নও বলে)। এখন একটা চেপ্টা নেচির উপরে খানিকটা (যতটা ধরে) মংসের পুর দিয়া আর একটা চেপ্টা নেচি দিয়া আবৃত কর। এবং চারিদিকের ফাঁক ভাল করিয়া টিপিয়া টিপিয়া বন্ধ করিয়া দাও। চপগুলির গড়ন দীপশিখার ন্যায় হইবে।

একটি গাঢ় পাত্রে ডিম (হাঁসের ডিম হইলেও চলিবে) ভাঙ্গিয়া ফেটাইয়া লও। পূর্ব্বেই চেপ্টা পাত্রে বিস্কুটের গুঁড়া রাখিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি। প্রথমে ফেটান ডিমে আলুর চপ ডুবাইয়া তারপরে বিস্কুটের গুঁড়ার উপরে ফেলিয়া দাও। চপের দুই পিঠে ভাল করিয়া বিস্কুটের গুঁড়া মাখাও।

তৈয়ে বা ফ্রাইপ্যানে আধপোয়া ঘি চড়াও। ঘিয়ের ধোঁয়া বাহির হইলে পর বিস্কুট গুঁড়া-মাখা পাঁচটা আলুর চপ একেবারে ছাড়। এক পিঠ লাল হইয়া আসিলে আর এক পিঠ উল্টাইয়া দিবে। বাদামী রং

হইলেই বুঝিবে ভাজা ঠিক হইয়াছে, তখন সে গুলি নামাইয়া অন্য গুলি ভাজিবে। দশখানা চপ হইবে।

ভোজনবিধি।—আলুর চপের সঙ্গে শুধু দুটি ভাত দিয়া খাইতে ভাল। ইহা ইংরাজী ডিনারে, আঁত্রে (Entree) মধ্যে একটা সাইড ডিসরূপে ব্যবহার হইবে। আমাদের সকালে ডাল ভাতের সঙ্গে এবং রাত্রে লুচির সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যয়।—আলু চার পয়সা, মাংস দুই আনা, ঘি তিন আনা, ডিম দু পয়সা, বিস্কুট তিন পয়সা, অন্যান্য মশলা দু তিন পয়সা। গড়ে সর্ব্বশুদ্ধ আট আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

রুষিয়া ও ইংলণ্ডের বাণিজ্য।

রুষিয়া বাণিজ্যের জন্য কতকটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, চারিদিকে পথ খুঁজিতেছেন তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপার কি উপায়ে ভালরূপে চলে। বাণিজ্যের জন্য চেষ্টা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য। এই বাণিজ্য ব্যাপার রাজাদের শিক্ষণীয় চারিটি বিদ্যার মধ্যে বার্ত্তানামক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ইহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; রাজলক্ষ্মীর উন্নতির জন্য রাজার বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। রুষ তাই রুষরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে লাগিয়া পড়িয়া উঠিয়াছেন। বাণিজ্য বিষয়ে ইংরাজের ন্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত নহেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইংরাজ বাণিজ্যের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন। ইংরাজের সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুষিয়ার পক্ষে বড়ই কঠিনকার্য্য। তথাপি ইংরাজ রুষের কার্য্যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন। ইংরাজ ভাবিতেছেন, রুষ ইংরাজের প্রাচ্য বাণিজ্যের অধিকাংশ একচেটিয়া করিবার—হস্তগত করিবার চেষ্টা

করিতেছেন। ইংরাজ ভাবিতেছেন রুষ চীনে বন্দর পাইয়াছেন, তাহাতে চীনও জাপানের বাণিজ্যব্যাপারে ইংরাজের প্রভাব কমিয়া যাইবে, কারণ সমস্ত চীনের ও জাপানের দ্রব্যাদি সাইবিরিয়ার রেলোয়ের সাহায্যে ইউরোপে যাইয়া উপস্থিত হইবে। বস্তুতঃ সাইবিরিয়ার রেলোয়েকে ইংরাজ বড় ভয় পাইয়াছেন। সাইবিরীয়ার রেলপথ প্রস্তুত হইলে ইংলণ্ড হইতে চীনে পঁহুছিতে পঁয়ত্রিশ দিনের পরিবর্ত্তে একপক্ষ বা আঠারো দিন লাগিবে। ইহাতে রুষিয়ার অন্তর্বাণিজ্যের কম উন্নতি হইবে না। উক্ত রেলপথ পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাসস্থান চায়না'র মধ্যে গিয়া পড়িতেছে, যে কোরিয়াতে রাশি রাশি মূল্যবান ধাতুর আকর আছে, সেই কোরিয়ায় গিয়া পড়িতেছে; এবং এই সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তিনকোটী পঞ্চাশ হাজার লোকের আবাদ জাপানের একবারে কাছে আসিয়া পড়িতেছে। রেল হইতে নামিয়া শুধু ষ্টীমারে জাপানে পঁহুছিতে দু'দিন লাগে। এই রেলোয়ের দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যের একটী মহাযোগসূত্র স্থাপিত হইবে। এই রুষ রেলপথ শেষ হইলে তাহা কানাডা প্যাসিফিক রেলোয়ে'র একটী প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিবে। এক্ষণে প্রাচ্যের রেশম ও চা'য়ের বাণিজ্যের অধিকাংশ কানাডা প্যাসিফিক রেলয়ের আয়ত্ত। কিন্তু সাই-বিরীয় রেলবর্ত্ম নির্ম্মাণ হইয়া গেলে, কানাডা প্যাসিফিক রেলোয়ে'তে আঘাত লাগিবে। এখন ঐ চা ও রেশমের জন্য রাশি রাশি ষ্টীমারে ছুটিতেছে তখন আর তাহা হইবে না;—লোকে সমুদ্র পথে অত ইন্‌স্যুরেন্স 'চার্জ্জ' দিয়া পাঠাইবার পরিবর্ত্তে রুষরেলের সাহায্যে পাঠাইতে সহজ বলিয়া মনে করিবে। এখন যে সিংহলের চা'য়ের প্রচুর রপ্তানি হইতেছে তাহার কারণ;—চীনের চা চালানের চেয়ে সিংহলের চা চালানে কিছু পয়সা বাঁচিয়া যায়। সেইজন্য চীনের চা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু সাইবিরীয় রেলপথ সমাপ্ত হইলে চীনের সমুদয় চা ইউরোপে পাঠাইবার সময় বণিকেরা জাহাজে না পাঠাইয়া রেলে পাঠাইবে। সিংহলের চা ইউরোপে যাইবার আগে চীনের চা ইউরোপে পঁহুছিবে। তাহাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের মহা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তখন রুষের রেলপথই প্রাচ্য দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার একটী প্রধান উপায় হইবে। রুষের বাণিজ্যের প্রভাব তাহাতে বাড়িয়া যাইবে।

তাই সাইবিরীয় 'রেল' রুষের বাণিজ্য ব্যাপারে এক মহা যুগান্তর উপস্থিত করিবে বলিয়া ইংরাজ বড় শঙ্কিত হইয়াছেন। ইহার উপরে রুষ ইদানীং পারস্য উপসাগরেও ব্যবসা বাণিজ্যের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ইংরাজ আরও অস্থির হইয়াছেন। পারস্যে অন্য জাতির অপেক্ষা রুষবাসীই অধিক; রুষিয়ার নিকটেই পারস্য, রুষিয়ার ইহাতে শীঘ্র পারস্যে রুষজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিবার সুবিধাও আছে; সেই কারণে রুষ যেমন পারস্যে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা প্রভুত্ব খাটাইতে পারিবেন এরূপ অন্য ইউরোপীয় জাতি নহে।—জর্ম্মণীও তুরকের সাহায্যে সমস্ত মুসলমান জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ পারস্যের মধ্যে আসিয়া পারস্যোপসাগরে একটা বন্দরাদি দখল করিয়া প্রাচ্যের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা খুঁজিতেছেন। ইংরাজ রুষিয়ার বাণিজ্য ব্যাপারে সুদূর ভবিষ্যৎ অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যাদি ভাবিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়াছেন। রুষিয়ার বাণিজ্য ব্যাপারের কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া যেমন তাঁহার প্রাণে আতঙ্ক লাগিয়াছে, এমন কিছুতে নয়। রুষিয়াকে ইংলণ্ড ভিতরে ভিতরে বড় ভয় পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।—আজকাল রুষ সংবাদ পত্র রুষের বাণিজ্য পথ চারিধারে উন্মুক্ত করিবার জন্য ক্রমাগত উত্তেজিত করিতেছেন। সেদিন স্বেট নামক একটী রুষ সংবাদ পত্র পারস্যের মধ্য দিয়া ভারত মহাসাগরের দিকে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য রুষিয়াকে বিশেষরূপে পরামর্শ দিয়াছেন; সহযোগী বলিয়াছেন যে, 'এটী সিদ্ধ হইতে পারে যদি পারস্যের মধ্যে দিয়া রেল চালাইয়া চৈহকবার উপসাগরের উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। কারণ এই উপসাগর বেলুচিস্থানের সীমান্ত হইতে ৬০ কিলোমেটার দূরে অবস্থিত। লৌহ গরম থাকিতে থাকিতেই পেটানো উচিত;—এখন পারস্যের কি রাজনৈতিক ব্যাপার, কি বাণিজ্য ব্যাপার সকল বিষয়েই রুষিয়ার প্রভাব আছে; এই বেলা সত্বর পারস্যে একটা রুষ রেলবর্ত্ম বিস্তার আবশ্যক। এখন ইংরাজেরা সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের দ্রব্যাদি পারস্যের দক্ষিণে খুব চলিতেছে, দেখিতে দেখিতে উত্তরদিকেও সমুদ্র স্রোতের মত আসিয়া পড়িবে তাহাতে রুষের বাণিজ্য এবং রুষের প্রতিপত্তি সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। যদি একবার ইংরাজ রেলপথ বা পারস্যের অন্তরে বাণিজ্য

পথাদি নির্ম্মাণের সুবিধা পায়। তাহা হইলে রুষের পক্ষে তাহা বড়ই ক্ষতি জনক হইবে। সেই হেতু আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

শ্বেট পত্রের মত রুষের কতক দলের মত; ইহা রুষ গভর্ণমেণ্টের মত নহে। রুষ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে রুষিয়া সর্ব্বাগ্রে মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করুক; এবং মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিরীয় রেলপথ প্রস্তুতাদি কার্য্য শেষ হইলে তবে রুষের অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত—এই পারস্যের রেল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া রুষ বসিয়া থাকিবেন না, ইতিমধ্যে রুষদূত টিহারাণে বসিয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন যাহাতে অন্য জাতি পারস্যে রেলবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিতে না পায়। যাই হোক এখন দেখা যাইতেছে যে রুষের রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোভও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্য লোভ প্রবল হইলেও আমাদের মনে হয় রুষ আপনার বাণিজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অপর জাতির বাণিজ্যের ব্যাপারে আক্রমণাদি করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। ইংরাজ পারস্যে ক্রমশঃই বাণিজ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন, রুষ বাধা দিতে পারিতেছেন না। কোন ইংরাজ বলিয়াছেন;—"Russia like the elephant. is rather unwieldy in attacking others, but most formidable in defending herself." নেপোলিয়নও রুষের এই চরিত্র গত ভাব শেষে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যাই হোক দেখা যাইতেছে যে, প্রাচ্যের বণিজ্যব্যাপার মুখ্যভাবে ইংরাজ ও রুষিয়া ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কালের গতি কেহ বুঝিতে পারে না। "কালস্য কুটিলা গতিঃ।" কালের গতি কে বুঝিবে? এই তো ইহার মধ্যেই জনরব উঠিয়াছে যে রুষিয়ার জার কোনও বিষয়ে হতাশ হইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিবেন কে জানিত সাই-বিরিয়াতে এরূপ রেলপথ হইবে? যে সাইবিরীয়াকে পূর্ব্বে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এখন তাহা সকলের কাছে আদরের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? চীনের এরূপ অবস্থা হইবে কে জানিত। যে চীনকে আগে সকলে ভয় করিত এখন তাহাকে কেহ

জয় করিতে চাহে না। ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না। তবে আপাততঃ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার উপর নির্ভর করতঃ এইটা মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে সম্প্রতি প্রাচ্যের বাণিজ্য ব্যাপার রুষ ও ইংলণ্ড উভয়ে প্রধানতঃ যেন ভাগ করিয়া লইতে চায়। উভয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধানত্ব রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ও উভয়েরই প্রচুর সুবিধা আছে। এখন দেখা কর্ত্তব্য যে প্রাচ্যের বাণিজ্য ব্যাপারে বাস্তবিক বিশেষ ভাবে কাহার জয়ের সম্ভব? আমাদের মনে হয় ইংলেণ্ডর। আপাততঃ রুষিয়া কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন বলিয়া ইংরাজ মনে করিতেছেন রুষিয়ার বাণিজ্য শেষে জয় লাভ করিবে। কিন্তু আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত মনে হয়। ইংলণ্ড এক বাণিজ্য ব্যাপার লইয়া জগতে কত না কাণ্ডই করিতেছেন। অন্য ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা ইংরাজ জাতির বাণিজ্য বুদ্ধি প্রবল ও অধিক বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ ইউরোপীয় সকল জাতির অপেক্ষা বাণিজ্যপটু। তাঁহারা সকল দেশে প্রথমে বাণিজ্য বেশে—বাণিজ্য সূত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং সেই বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ সমূহ নিজের অধিকারে আনিয়াছেন। এবং এই সঙ্গে দেশ সমূহের উন্নতিসাধনেও যত্নবান হইয়াছেন। ভারত তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাই মনে হয় বাণিজ্য ব্যাপারে রুষিয়ার দৈব সুযোগ হইলেও ইংরাজের পুরুষকারের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না। রুষ, বাণিজ্যে ইংরাজের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অলস ও অকর্ম্মণ্য। শঙ্করজ রুষ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্যে ইংরাজ পুরুষসিংহের কাছে কতক্ষণ আঁকিয়া উঠিতে পারিবেন? এক্ষণে কালের গতি যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় পুরুষকারের বলে বৃটীশসিংহ সকল ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা বাণিজ্যে লক্ষ্মী শ্রীলাভ করিবেন। বৃটীশসিংহের তুল্য উদ্যোগী জাতি পৃথিবীতে এখন দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।"

শ্রীঃ—

৮

শিবরামের বাড়ীর কাছে হরনাথের বাড়ী। হরনাথ বাড়ীর চৌকাটে বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং আর একটা হুঁকো রাখিয়া দিয়াছেন শিবরাম যদি আইসেতো তাঁহাকে দিবেন। শিবরামের বাড়ী যাইতে হইলে হরনাথের বাড়ীর ধার দিয়া যাইতে হয়। দেখিতে দেখিতে শিবরাম হরনাথের বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত্ হইলেন। হরনাথ বলিলেন "ভাই শিবু এস ব'সো একটু তামাক খেয়ে যাও। তোমার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে।"

শিবরাম হরনাথের কাছে বসিলেন ও তামাকু টানিতে লাগিলেন। হুঁকার নলোদ্গীরিত ধূম বায়ু বেগে ঘূর্ণায়মান হইয়া শূন্যে বিক্রীড়িত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে হরনাথ ও গুড়্ গুড়্ করিয়া তাঁহার গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে আর কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। হরনাথ তাহার বাক্স হইতে একটা পত্র লইয়া শিবরামকে দেখিতে দিলেন; শিবরাম তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে কখনো ভ্রূভঙ্গী সহকারে রোষকষায়িত লোচনে মুহূর্ত্ত তরে কি চিন্তা করিয়া লইলেন, পরক্ষণে হাসিলেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া হরনাথ বলিলেন 'কি ভাই হাস্‌চো যে, দেখ্‌লে বুঝলে ভীমরামের কি আস্পর্দ্ধা দেখ্‌লে! তার সঙ্গে উনি বিয়ে কর্ত্তে চান। মনে কচ্চেন জমীদারের আদুরে আমলা তবেই আর কি ওঁর সঙ্গে কমলার বিয়ে দিতে হবে।' শিবরাম হুঙ্কার স্বরে বলিয়া উঠিল "ও কাজ কোরোনা কোরোনা, মেয়েটার সর্ব্বনাশ হবে। মেয়েটা এখন কোথায় আছে?" হরনাথ কহিল 'বারুই গ্রামে আছে। হরিনাথের কিন্তু বড়ই ইচ্ছা ভীমরায়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। আমি তাহাকে বার বার ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছি। তবু তার বিয়ে দিতে ইচ্ছে। আমাকে চাট্টে চিঠি লিখেছে আমার মত করিবার জন্য। আমি মত দিইনি। আমার একবার সেখানে যেতে হবে। কালকের-জোয়ারেই চ'লে যাব। আমার শেষ দুটো চিঠির আমি উত্তর পাইনি। তাই কিছু অর্থ বুঝ্‌তে পারিনে।' দুজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা

চলিতেছে এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক দুয়ারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। হরনাথ তাহার চাকরকে ডাকিয়া কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। এই সময়ে শিবরাম হরনাথের কাছে বিদায় লইয়া নিজ গৃহে গেলেন। হরনাথ একা বসিয়া আছেন কিছুক্ষণ পরে তাহার চিঠিটী কোলের কাছে রাখিয়া স্বীয় গাত্রে পাখা ব্যজন করিয়া আয়েস করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ভিক্ষুক থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে ভিক্ষার কাতর ধ্বনি করিতে লাগিল। চাকর এখনও কিছু পয়সা লইয়া আসিল না দেখিয়া তিনি স্বয়ং করুণাপূর্ণ চিত্তে উঠিয়া পয়সা লইয়া আসিবার জন্য অপর এক প্রকোষ্ঠে গেলেন। এমন সময়ে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল "কই ভিক্ষুককে তো দেখ্‌তে পেলেম না। ভিক্ষুক তবে চলিয়া গেছে।" হরনাথ ক্রোধভরে কহিলেন "তুই যে দেরী করলি কখন বলেছি ভিক্ষার জন্য কিছু এনে দিতে। কতক্ষণ বেচারা আর দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, চ'লে গেছে।" এই বলিয়া হরনাথ বাড়ীর বাহিরের চাতালস্থিত কক্ষে বসিয়া পড়িলেন।—বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন এবং হাত বাড়াইয়া তাহার দুটী পত্র লইবার জন্য দেখিতে লাগিলেন। একটী পত্র তাহার ভাই হরিনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছে অপরটী তিনি হরিনাথকে লিখিয়াছেন।—"কি আশ্চর্য্য! পত্র দুখানি কোথা গেল—কে নিলে চাকর বাকরকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে পারিল না তাঁহার পত্র দুয় কোথায়। শেষে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন বলিতে লাগিলেন "বাতাসে তো উড়ে যায় নি যে রকম বাতাস ব'চ্চে। না, না তা কি কখনো হয়। যাক্ আজ আর পারিনে। কাল সকালে খুঁজে দেখবো এখন। কাল ফের আলাদা একটা চিঠি লিখ্‌তে হবে।" এক্ষণে হরনাথ নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। চাকরকে ডাকিলেন চাকর আসিয়া গা হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। হরনাথ মহাসুখে নাক ডাকিতে ডাকিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভৃত্যটী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া মনিবের হুঁকো হইতে কল্কেটী তুলিয়া লইয়া চার টান মারিয়া পুনরায় কল্কেটী হুঁকোর উপরে বসাইয়া প্রভুর চাতালস্থিত কক্ষের দুয়ারের পার্শ্বে আয়োজন করত শয়ন করিল।

৯

এখানে পাঠককে একটু বলিয়া দিই—পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ভিক্ষুকটী ভীমরায়। ভীমরায় বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সাজে আসিয়া হরনাথের বাড়ী হইতে যদি কিছু তাহার অভিলষিত বিষয় জানিতে পারে এইজন্য আসিয়াছিল। তাহা জানিতে পারিল। সে সুবিধা পাইয়া হরনাথের পত্রদ্বয় তুলিয়া লইয়াই সে চম্পট্। নিজ গৃহে আসিয়া সেই পত্রদ্বয় পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিল "বুঝেছি কমলার সঙ্গে বিয়ে দিতে হরিনাথের আপত্তি নাই, হরনাথের বিশেষ আপত্তি। হরনাথ আবার চিঠিতে তাহার বন্ধু শিবরামের কথা উল্লেখ করিয়াছে। হরিনাথের মেয়ে তার আপত্তি নেই ওঁর আবার আপত্তি। বুঝেছি হরনাথের ইচ্ছে শিবরামের সঙ্গে 'বিয়ে দেয়।', আচ্ছা আমি শীঘ্রই হরনাথকে টের পাওয়াচ্ছি। আর শিবরামটাকে তা একবার দেখ্‌তে হবে। সর্ব্বপ্রথমে আমার শিবরামের সর্ব্বনাশ কর্‌তে হবে। ত নৈলে আমার আর নিস্তার নাই। হরনাথ যে রকম ধড়িবেজে লোক হরিনাথের মন ঘোরাতে কতক্ষণ হরিনাথের মন ঘুরিয়ে শিবরামের সঙ্গে, তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে এখন। যাক্ শীঘ্র শীঘ্র কাজটা ভালরূপ বাগিয়ে আন্‌তে হবে। হরিনাথ যদি হরনাথের কথা শুনে কাজ করে তো হরিনাথের নিশ্চয় মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে বুঝতে হবে।

হরিনাথের মন বুঝেছি হরিনাথের বাড়ী গিয়ে শীঘ্র শীঘ্র বিয়ের ঠিক-ঠাক করতে হবে। হরিনাথের মতটা পেলেই একবারে তৎক্ষণাৎ কায সেরে ফেল্‌তে হবে।

আর বিলম্ব নয়, আর বৃথা কল্পনা নয় কাল হ'তে বিবাহের উদ্যোগে আমাকে ব্যতিব্যস্ত হ'তেই হবে। পশুপতি বাবু আমাদের মধ্যে আমা-কেই সব চেয়ে পছন্দ করেন ও ভালবাসেন আমার আর কিসের ভয়। যাক্ আজ ঘুমোই।"

নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই ভীমরায়ের নাসিকা-রন্ধ্র ভীম গর্জ্জন করিতে লাগিল; শুনিয়া গৃহে বিড়াল প্রবেশ করিতে ছিল প্রবেশ করিতে পারিল না, আস্তে আস্তে লাঙ্গুল গুটাইয়া চম্পট দিল।

ই একটী বাড়ীর ভৃত্যের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভীমরায়ের নাসিকার বাঁশরী-বিরাব তাহাদের আর সহ্য হইল না; তাহারা উঠিয়া অন্যত্র ঘুমাইতে গেল।

ভীমরায়ের নাসিকাধ্বনি তিনি নিজে কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, এমনি ঘোর নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্য সকলের পার্শ্বস্থ কক্ষে নিদ্রার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতেছিল। কিন্তু তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত নাই, তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। গভীর নিদ্রার মাঝে সহসা তিনি কি স্বপ্ন দেখিয়া "ধর শিবুকে ধর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া পুনরায় ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। দুএকটী ভৃত্য শুনিয়া তাঁহার কক্ষে উঠিয়া আসিল—ভাবিল চোর আসিয়াছে বুঝি তাই মনিব ঐরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন। আসিয়া দেখিল "কেউ কোথাও নেই। কিন্তু যেখান দিয়ে চোর আসিবার সম্ভাবনা মনে করিল সেই দরজাটী তাহারা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার আপন আপন শয্যা পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল।

প্রাতঃকাল পাখীরা কলরব করিতেছে। তরুণ বিভাকর স্বীয় অরুণ প্রভা বিস্তার করিয়াছেন। একে একে লোক জনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ভীমরায়েরও নিদ্রা ভাঙ্গিল। দেখিল দক্ষিণের দরজাটী বন্ধ রহিয়াছে। তিনি রুষ্ট হইয়া ভৃত্যকে চীৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন "বেস এ দক্ষিণের দরজাটী বন্ধ ক'রেছিস্? আমি কাল খুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিলুম কেন বন্ধ ক'রেছিস! শেষ রাত্রে তাই কেমন গরম ঠেকছিল। ভৃত্য কহিল "হুজুর আপনি কাল্ অর্দ্ধ রাত্রে "ধর শিবুকে ধর" ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছে এক শিবু উড়ে আছে সে বড্ড চোর। যদিও খুঁজে দেখ্‌লেম কেউ নেই তবুও হুজুর চেঁচিয়ে ওঠাতে ভাবলেম হয়তো বা শিবু উড়ে ঢুকেছিল। তার পরে কোথাও নাই দেখে ও হুজুর খুব ঘুমাচ্ছেন দেখে চোর যে দিক দিয়ে আসবার সম্ভাবনা সেই দরজাটী বন্ধ ক'রে গিয়ে চ'লে গেলেম। ভীমরায় ঈষৎ হাস্য মুখে কহিলেন "তা বেশ ক'রেছিস আমার এখন মুখ ধোবার ও স্নানের সব ঠিক কর।" ভৃত্য অগ্রে চলিয়া গেল; ভীমরায়ও তাঁহার নধর কলেবরটী দোলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

১০

পূর্ব্বে বলিয়া আসিলাম ভীমরায় শীঘ্র শীঘ্র হরিনাথের বাড়ী যাইয়া কমলার সঙ্গে তাহার বিবাহ যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তাই আজ বৈকালে নৌকা করিয়া ভীমরায় হরিনাথের বাড়ী গিয়াছেন।—গিয়া দেখেন হরিনাথ বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া আছেন। হরিনাথ ভীমরায়কে দেখিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ সহকারে বসাইলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হর্ষে বিষাদের সঞ্চার হইল। ভীমরায় কহিলেন "হরিনাথ তোমায় এরকম বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? হরিনাথ কহিলেন "তোমায় আর কি বল্‌বো। তোমার জন্যই এত কাণ্ড। ভীমরায় হরনাথের পত্রদ্বয় পড়িয়া পূর্ব্ব হইতেই সব জানিতেন, কিন্তু যেন কিছু জানেন না এইরূপ ভাণ করিয়া কহিলেন "ভাই আমার জন্য কি অর্থ কিছু বুঝতে পারলেম না" তখন হরিনাথ কহিলেন "তবে শোন খুলে বলি আমার কমলার তোমার সঙ্গে যাতে বিয়ে হয় তাই আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার দাদার তাহাতে আদৌ ইচ্ছে নাই। তাঁর ইচ্ছা শিবরাম বলিয়া তাঁহার একজন জানা শুনো বন্ধু আছে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন। কমলার মনকেও তাঁদের তরফে ক'রেছেন। কমলাও শিবরামকে বিয়ে কর্ত্তে চায়। আমার কিন্তু কিছুতেই মত নেই। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিলুম যাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়, আমার মেয়ের আমি ভাল বুঝিতো। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে বাস্তবিক বল্‌ছি ভীম আমার আর কোন ভয় থাকে না, দিব্যি সুখে থাকবে। তোমার বাঁধা মাইনে, কমলার কোন দুঃখ থাকবে না। ভীমরায় ভাণ করিয়া কহিলেন "সে ভাই তোমার ইচ্ছে আমরা ভাই গেরস্থ মানুষ আমাদের দিন এক রকম চ'লে যায়। কমলার সঙ্গে বিয়ে সে ভাই তোমার ইচ্ছে, সে আমার মত লোকের কি সৌভাগ্য হ'তে পারে।" হরিনাথ কহিলেন "সে আমার পরম সৌভাগ্য ভীম যদি তোমার হাতে আমার কমলাকে সম্প্রদান কর্ত্তে পারি। কিন্তু আমার দাদার তাহাতে ইচ্ছে নেই। তিনি কমলাকে তাঁহার ওখানে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে পাঠায়েছিলেন। আমি তাই ঝি চাকর সঙ্গে দিয়ে নৌকা ক'রে তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে ছিলেম। আজ শুনছি!—ঝি চাকর মাঝ পথ থেকে

সব চ'লে এসেছে। বল্লে তাদের নৌকা যেমন একস্থানে কিনারায় লাগিয়েছে রাত আটটার সময় একদল ডাকাত এসে আক্রমণ ক'রে নৌকার জিনিষ পত্র সব লুটে নিয়ে গেছে কেউ তার সন্ধান করতে পারছে না ভৃত্য কি ঝি চাকর না এসে পৌঁছিলে বুঝতে পারছিনে! চারিদিকেই গুপ্ত ডাকাতের বড় প্রাদুর্ভাব হয়েছে। পথে মেয়ে ছেলে নিয়ে চলা দায়। বলিতে বলিতে হরিনাথ ভয়ে ব্যাকুল হইলেন। ইহা শুনিয়া ভীমরায় ঈষৎ কাতর হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে ক্রুদ্ধ চিত্তে কহিলেন "আজই ভাই যাচ্চি প্রভুকে গিয়ে বল্‌চি যাতে ডাকাতিটা বিশেষরূপে দমন হ'য়ে যায়। আমাকে আজ মাপ কর ভাই। আজই আমি কাছারিতে গিয়া জমীদারকে ব'লে কমলার খোঁজ করাচ্ছি। কমলার না যদি উদ্ধার হয় তো জান্‌বো জমীদারের জমীদারী আর থাকবে না।"

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

সঙ্গীত তরঙ্গ ও সাহিত্য পারিষদ।

আমরা ১০ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশ পাঠে জানিলাম যে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একটী গ্রন্থ সাহিত্য পরিষদে প্রদর্শন করিতেছেন। সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে—"বঙ্গভূমি পাঠে জানা গেল যে ১২২৫ সালের (১৮১৮) 'সঙ্গীত তরঙ্গ' নামে একখানি সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থ বাঙ্গলা অক্ষরে এই কলিকাতা সহরে ছাপা হয়। ৺রাধামোহন দাস ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থের সমস্ত অংশ বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত। কলিকাতা বাঙ্গলা প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীরাম রায় কর্ত্তৃক খোদিত কয়েকখানি ছবিও আছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই পুস্তকের এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিষদের আগামী মাসিক অধিবেশনে এই গ্রন্থখানি প্রদর্শিত হইবে।"

এই প্রদর্শনে আমরা বিশেষ নূতনত্ব কিছু দেখিতে পাইলাম না। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের ভক্তদিগের অনেকের নিকট এই পুস্তক পরিচিত। তাঁহারা বাঙ্গলা সঙ্গীত গ্রন্থের মধ্যে 'সঙ্গীত তরঙ্গ'র প্রাধান্যও স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সমীরণ" নামক মাসিক পত্রে "গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু" শীর্ষক প্রবন্ধে নায়কের লক্ষণ বলিবার কালে এই "সঙ্গীত তরঙ্গ" হইতেই নায়কের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ বাবু ইহা 'সমীরণ' পত্রে দেখিয়া লইতে পারেন। আরও এই "সঙ্গীত তরঙ্গ" গ্রন্থটী পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকাগারে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তদীয় অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা প্রাপ্ত হইয়া উহার নব-সংস্করণ আমাদিগের গৃহ পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া যাইতেছিলেন। টীকাটিপ্পনী ও ভূমিকা প্রভৃতি সম্বলিত সেই নবসংস্করণ খানি ভবিষ্যতে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে।

***

৺কবি রসসাগরের জীবনচরিত—শ্রীশ্যামাধব রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। তাঁহার সুরসিকতা প্রভৃতি কারণে নবদ্বীপাধিপতি ৺গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর নিজের নিকটে রাখিয়া "রসসাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভাদুড়ী উপাধিতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের নিকটবর্ত্তী বাঁড়িবাঁকা গ্রামে ১১৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল উপস্থিত রচনা। কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ উপস্থিত রচনা বঙ্গবাসীর বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচালী, কবির লড়াই প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। বর্ত্তমানে থিয়েটার যেমন, কিছু পূর্ব্বে পাঁচালী প্রভৃতি ধনীদিগের ততোধিক প্রিয়বস্তু ছিল। অনেক উপস্থিত কবি তাঁহাদিগের পারিষদরূপে নিয়মিত বেতন পাইতেন। দুঃখের বিষয় ক্রমে এইরূপ উপস্থিত রচনা পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত ও অশ্লীল বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ প্রাপ্ত না হইয়া অকালে মৃত্যু-

মুখে পতিত হইয়াছে। রসসাগর যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শ্লোকগুলি জীবনী সহকারে কত না নূতন সংস্করণে প্রকাশিত হইয়া পুস্তকাগার সমূহের শোভা বর্দ্ধন করিত। শ্রীমাধব বাবু যে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুভার সত্বেও এই উপস্থিত বক্তার জীবনী সংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন নিঃসন্দেহ। সমালোচ্য গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণের; প্রথম সংস্করণ প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি যে এই দ্বিতীয় সংস্করণে রসসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। প্রকাশক নবদ্বীপাধিপতির অতি নিকট আত্মীয় হইয়াও যখন বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া দুরাশা মাত্র। তথাপি ইহার অতিরিক্ত দুএকটী বিষয় যাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহাও এই স্থলে উল্লেখ করিব। রসসাগরের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে ও কন্যাটীর শান্তিপুরে বিবাহ হয়। রসসাগরের জীবনের শেষভাগ জামাতৃ গৃহেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের রাজবংশ বিদ্যার উৎসাহদানে মুক্ত হস্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। মহারাজা গিরিশচন্দ্র রায়ও যে এ বিষয়ে পশ্চাদপদ হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইনিই উৎসাহদানে রসসাগরের রসের ভাণ্ডার পূরিপূর্ণ করাইতে পারিয়াছিলেন। একদা রাজসভায় রসসাগর চারি চরণে একটী সমস্যা পূরণ করিয়া মহারাজার নিকট চারি টাকা পুরস্কার পাইলেন। রসসাগর চরণে চরণে টাকা দেখিয়া কহিলেন 'মহারাজ, যদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করেন তবে অন্যভাবে ছয় চরণে এই সমস্যা পূরণ করি।' এই বলিয়া ছয় চরণে পাদ পূরণ করিয়া ছয়টাকা পুরস্কার পাইলেন। পুনরায় আট চরণে ঐ সমস্যা পূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।" রসসাগরের দ্রুত পূরিত শ্লোকগুলিতে যদিও ছন্দোবিষয়ক কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইত, কিন্তু অবকাশ রচিত কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইত। তিনি যখন এমন উপস্থিত মত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তখন তিনি যে রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন তাহাও বলা বাহুল্য। একদা কোন ভূম্যধিকারীর বাটীতে

কোন কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েন। দক্ষি(ণা) প্রদানের গৃহ দ্বারটী কিছু ক্ষুদ্র ছিল। প্রবেশ করিবার কালে রসসাগ(র) আঘাত পাওয়াতে সভাস্থ সকলে হাঁসিয়া কহিলেন "আহা, বড় লাগিয়াছে" রসসাগর তদুত্তরে "কি করি, ছোট দুয়ারে তো কখন আসা অভ্যাস নাই" বলিয়া সকলকে অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ করিয়া দিলেন।

একবার রাণাঘাটে পালচৌধুরী বাবুদের বাটীতে গোবিন্দ অধিকারী(র) যাত্রা হইতেছে, লোকে লোকারণ্য; আর সেই ভিড় ঠেলিয়া যাইতে পারিতেছেন না—এখন উপায়? দেখিতে দেখিতে যাত্রার বাসুদেব প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখা গেল। রসসাগর এই অবসরে সেই বাসুদেবকে খুব জোরে জড়াইয়া ধরিলেন। বাসুদেবের যত ডাক পড়ে, বাসুদেব চীৎকার করে যে "আমার নড়িবার যো নাই, আমাকে এক বামুনে ধরেছে"। বাবুরা তখন বাহিরে আসিয়া দেখেন যে রসসাগর বাসুদেবকে ছাড়িতেছে না—কারণ জিজ্ঞাসায় রসসাগর বলিলেন "এরূপ না করিলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিব কিরূপে? বলা বাহুল্য যে তিনি সাদরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমস্যা পূরণে ও রসসাগরের আশ্চর্য্য ক্ষমতার দুএকটী পরিচয় দিয়া এই পুস্তকের সমালোচনায় উপসংহার করিব। মহারাজ "টুক্ টুক্ টুক্" বলাতে রসসাগর নিম্নলিখিত চারি রকমে পাদ পূরণ করিলেন;—

১

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি॥
অধৈর্য্য দেখিয়া হর, পেতে দিলেন বুক।
হরহৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

২

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর অরি পেতে দিল বুক।
অসুরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥

৩

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্য নাহি হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

৪

পথমধ্যে দাঁড়াইয়া পরমা সুন্দরী।
ভুবনমোহনরূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্॥

এইরূপ একটী চরণ হইতে নানাভাবে উপস্থিত মত পাদ পূরণ যে ক্ষমতার কাজ তাহা বলা বাহুল্য। কঠিন সমস্যাও তিনি সহজে পূরণ করিতেন—একদা প্রশ্ন হইল "রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।" এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজকালকার ছেলেদের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও চলে। রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন ;—

লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল॥

এখানে লক্ষ্মী শব্দে তণ্ডুল ও নারায়ণ শব্দে জল বুঝায়। ভাত হইবার সময় যত জ্বাল দেওয়া যায়, তাই জল চালের ভিতর প্রবেশ করে। আমরা আর দুটী দৃষ্টান্ত দিব। প্রশ্ন হইল "বড় দুঃখে সুখ"; রসসাগর পূরণ করিলেন ;—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা কয় চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

"কোন সময় রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে

গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় ডাক হরকরা ঘাটে আসিয়া মুকুন্দ নামক ঘাটমাঝিকে ডাকিতে থাকায় হঠাৎ উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন রসসাগরের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন "মুকুন্দ মুরারে।" রসসাগর উত্তর দিলেন—

পাপের পুঁজিন্দা বয়ে ভগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

এই কবিতা যে দ্ব্যর্থবোধক, তাহা বিবেচক পাঠক অগ্রেই দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত পাত্রেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত ঠাকুর গোষ্ঠীর যেরূপ সদ্ভাব ও বন্ধুতা আছে, তাহাতে ঠাকুর গোষ্ঠীর মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করিয়া প্রকাশক তাঁহার বন্ধুতার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমাদেরও এরূপ দীর্ঘ সমালোচনার কারণ এই যে গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য আছে এবং আমাদের সম্মান লাভের উপযুক্ত পাত্র।

পুণ্য।

যজ্ঞ ও অগ্নি।

পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিলাম ঋষিরা দেবপূজার কারণে যে জগতে যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিলেন তাহাতে অগ্নি সর্ব্বপ্রধান আসন গ্রহণ করিত। অগ্নি বিনা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইতে পারিতনা। ঋগ্বেদের কোন সূক্তে অগ্নি 'যজ্ঞের সম্রাট' 'বিদথেষু সম্রাট' * বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্নি কোন্ সময় হইতে মানবের কার্য্যে আসিয়াছে তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক কে বলিতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই মধুচ্ছন্দা ঋষি বলিতেছেন,—

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

"অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতি ভাজন হইয়া আসিতেছেন, এবং নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন"। সম্ভবতঃ আদি কাল হইতেই অগ্নির সঙ্গে মানবের পরিচয়। অগ্নিতেজই প্রথমে মনুষ্যকে অগ্নির প্রভাব বুঝাইয়া দিয়াছিল। ক্ষুধার সময়ে মনুষ্য যখন অগ্নিতাপের অনুরূপ তীক্ষ্ণ তাপ বা দাহ অনুভব করিল তখনও বুঝিল যে শরীরের অভ্যন্তরে অগ্নি কার্য্য করিতেছে। পশুরাও অগ্নির প্রভাব অনুভব করিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞান বা ধীশক্তির অভাবে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বুঝিতে পারেনা। মনুষ্যের কিন্তু এই জ্ঞান বা ধীশক্তিটুকু থাকাতেই একটা কোন ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই সে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। যখন বজ্রাগ্নিতে পর্ব্বতশৃঙ্গ ভগ্ন চূর্ণ হইতে লাগিল, যখন বৃক্ষের শাখায় ঘর্ষণ লাগিয়া অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন মানবকে অন্তর্নিহিত

---

* ঋগ্বেদ তৃতীয় মণ্ডল ৫৫ সূক্ত।

ঈশক্তি ভিন্ন আর কে তাহার কারণ বুঝাইয়াছিল! কাষ্ঠে কাষ্ঠে বা প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ইহা মানব প্রথমে প্রকৃতি-পুস্তক পাঠে শিক্ষা করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে আদিযুগে দেবগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রজাপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। মহাতেজস্বী অঙ্গিরা এই প্রজাপতিগণের অন্যতম। মহর্ষি অঙ্গিরাই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে মানবের কার্য্যে অগ্নির আবশ্যকতা বুঝিয়া অগ্নিকে নিয়োগ করেন। মহাভারতের একস্থলে দেখা যায় অগ্নি প্রজাপতি অঙ্গিরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে

ত্বমগ্নিঃ প্রথমো ভব ভবিষ্যামি দ্বিতীয়োহং *

“তুমি প্রথমাগ্নি হও, আমি দ্বিতীয় হইব।” একথার তাৎপর্য্য এই যে অঙ্গিরাই অগ্নিকে প্রথম প্রচলিত করিয়াছেন তাই গুরুস্বরূপ অঙ্গিরাকে অগ্নি যেন প্রথম আসন দিতে প্রস্তুত। অঙ্গিরা নামেও বুঝা যায় যে অগ্নির সহিত অঙ্গিরার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তটীতেও অগ্নিকেই অঙ্গিরা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে

যদংগ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমংগিরঃ॥

হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন করিবে, হে অঙ্গিরা সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

অগ্নির এই ‘অঙ্গিরা’ নাম ইহার প্রথম প্রচলনকারী মহর্ষি অঙ্গিরার নাম হইতেই আসিয়া থাকিবে। অঙ্গিরা যে এই মানবের কার্য্যে অগ্নিপ্রচলনের সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন সেই অবধি অগ্নির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। নানাবিধ সংসারিক কর্ম্মের সুবিধার জন্য ক্রমে অগ্নি সকলেরই প্রিয় বস্তু হইয়া উঠিল। রজনীর অন্ধকারে অগ্নি আলোক প্রদান করিতে লাগিল। লোকে অগ্নির সহায়ে কঠিন ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি গলাইতে লাগিল। অগ্নি পাক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও যজ্ঞের দ্বারা যেমন অগ্নির সম্মান বাড়িল এমন আর ইতিপূর্ব্বে অন্য কিছুর দ্বারা হয় নাই। তাই জাতবেদা অগ্নিকে আবাহন করিয়া ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথম সূক্তে বৈদিক ঋষি গাহিয়াছেন—

* বনপর্ব্ব ২১৭ অধ্যায়।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং হোতারং রত্নধাতমম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্, অগ্নি হোতা, ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।"

ইহাই ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথম ঋক; ইহার সর্ব্বপ্রথম শব্দটীও অগ্নি। যজ্ঞে অগ্নির প্রচলন হওয়া অবধি উহার সম্মান বৃদ্ধি হইল কেন তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। কোন ব্যক্তি নিজের স্বার্থ বা সুখভোগের জন্য অর্থ ব্যয় না করিয়া যদি তাহা দরিদ্রভরণ প্রভৃতি সাধারণের শুভকার্য্যে ব্যয় করে তাহাতে তাহার অর্থের যেমন সার্থকতা ও সম্মান বৃদ্ধি হয় ইহাও সেইরূপ। গৃহে নিজ নিজ পাককার্য্যপ্রভৃতির জন্য অগ্নির আদর ত ছিলই কিন্তু তদপেক্ষা আদর বা সম্মান বৃদ্ধি পাইল তখন যখন অগ্নি যজ্ঞরূপ সাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। যজ্ঞীয় অগ্নির দ্বারা দেবগণের তুষ্টিসাধনে বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলজনক হয়, ইহাই প্রধানতঃ অগ্নির গৌরব বৃদ্ধির কারণ। তাই অগ্নি বৈদিক ঋষিদিগের নিকট পুরোহিত, যজ্ঞের সম্রাট বলিয়া সম্মানভাজন হইয়াছেন।

বাস্তবিকই সে সময়ে যজ্ঞাদির নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে দেবগণ হিমালয়ের ঊর্দ্ধে পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। সে প্রদেশে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকিত। কাশ্মীর, তিব্বত, পামির প্রভৃতি হিমালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহ পুরাকালে স্বর্গধামের অন্তর্গত ছিল। এখনও যেমন ভূগোলে পামিরের উচ্চভূমিকে "পৃথিবীর ছাত" Roof of the world বলিয়া থাকে সেইরূপ সে কালে এ প্রদেশ দেবগণের আবাস সুমেরু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানেও এ প্রদেশের কোন কোন অংশ সেই প্রাচীন সুমেরু নাম পরিত্যাগ করে নাই দেখা যায়। 'সুমরখণ্ড' নাম 'সুমেরুখণ্ড' হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এই দেবধাম হইতে আর্য্যেরা ক্রমে দক্ষিণে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেবগণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান বিষ্ণুর এই ভারত ভূমির দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি দক্ষিণে একপদ অগ্রসর হইয়া দেবলোক হইতে ভারতের মৃত্তিকাময় মর্ত্তভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু ভারতে প্রথম পদনিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই বিষ্ণুপদ ভারতে চিরদিন সম্মানিত হইয়া

আসিতেছে। তাই ভারতের মৃত্তিকা 'বিষ্ণুপদাক্রান্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু প্রথমে ভারতে অবতরণ করিয়া ভারতে আর্য্য উপনিবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন বলিয়াই ঋষিরা বিষ্ণুর সেই সুকীর্ত্তি স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিবার জন্যই ভারতের মহাপুরুষগণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গণ্য করেন। অর্থাৎ বিষ্ণু যেমন ভারতে অবতরণ করিয়া ভারতকে ঘোর অন্ধকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া জনসমাজের উপযোগী করিয়া তুলিলেন সেইরূপ বিষ্ণুর অবতারেরাও যুগে যুগে ভারতকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া আলোক প্রদান করেন। বিষ্ণুর অনুবর্ত্তী হইয়া অনেক আর্য্য ঋষিরা ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে ভারতের ব্রহ্মাবর্ত্ত লোকসঙ্কুল জনপদে পরিণত হইল। ঈশ্বর মনের নিয়ন্তা। তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ভাব প্রদান করেন। বৈদিক ঋষিরা দেবগণের স্মরণার্থে অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ হোমাদি করিতে লাগিলেন। ভারতের অরণ্যে সে সময়ে যে সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে সময়ে জনশূন্য ভারতের অরণ্য প্রদেশে অগ্নির সহায় ভিন্ন বসবাস করিবার কোন উপায় ছিলনা। যজ্ঞের নামে তাঁহাদিগকে নিত্য সমিধভার আহরণ করিতে হইত, ইহাতে অনেক অরণ্যের বৃক্ষাদি ভস্মীভূত হইয়া লোকবাসের উপযোগী হইয়া উঠিতে লাগিল; ক্রমে ঋষিরা সেইস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুদ্ধ ইহাই নহে, অরণ্যের দুষ্ট বায়ু, ঘৃতাদির সৌরভে এবং অগ্নির সঞ্চালনী শক্তির দ্বারা দূরীভূত হইতে লাগিল। অরণ্যচর পশুরাও অগ্নির ভয়ে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। ঋষিদিগের দেবযজ্ঞ হইতে এতগুলি বিষয় আনুষঙ্গিকরূপে সংসাধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাই যজ্ঞের উপকারিতা বুঝিলে লোকে উহার আদর বাড়িতে লাগিল। ঋষিরা ঋক রচনার অপেক্ষা যজ্ঞেতেই অধিক মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু ঋগ্বেদ যে কেবল প্রাকৃতিক অগ্নিকেই সম্মানিত করিয়াছেন তাহা নহে, অগ্ন্যুপাধিক মনুষ্যকুলও বেদে সম্মানিত হইয়াছেন। পুরাকালে এক শ্রেণীর মনুষ্যদিগের উপাধি অগ্নি ছিল। এই অগ্নি নামা মনুষ্যকুলের ক্রিয়া কর্ম্ম সকলি বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন পূজারি ব্রাহ্মণকুল ঠাকুরের নামে ঠাকুর উপাধি লাভ করিয়াছেন এই অগ্ন্যুপাধিক মনুষ্যকুলের বেলাও সেইরূপ ঘটিয়াছে দেখা যায়। প্রজাপতি অঙ্গিরার পর-